Approved by the Director of Public Instruction, Bengal for Prise & Library Books in Primary & M.E. Schools and also in the lower classes of High Schools (Vide Calcutta Gazette 22nd July 1936)

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

দ্বিতীয় সংস্করণ

আষাঢ়
১৩৪৪

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দাম দশ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিমি

সমুদ্রের জন্মকথা

আমাদের গোটা পৃথিবীকে ঘিরে আছে, সদা চঞ্চল, নীল, গভীর জলরাশি। আমরা এর নাম দিয়েছি,—সমুদ্র। কিন্তু পৃথিবীর এমন একদিন ছিল যখন তার কোথাও স্থল বা জল কিছুই ছিল না। পৃথিবী ছিল তপ্ত বাষ্পময়, আর তার চারধারে আকাশের বহুদূর ব্যেপে ছিল তপ্ত বাষ্পরাশি। ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে লাগল। পৃথিবী তাপ ছাড়তে ছাড়তে ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল, আকাশের বাষ্পরাশিও ক্রমে শীতল হতে শীতলতর, তা থেকে শীতলতম হয়ে জলভারাতুর মেঘে পরিণত হল। সেই মেঘভার থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণে পৃথিবীতে জন্ম হল সমুদ্রের।

কিন্তু সে বহু লক্ষ বৎসর আগেকার কথা। তখনকার সমুদ্র এমন লবণাক্ত, গভীর ও সুদূর বিস্তৃত ছিল না। লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্ত্তনে ও নানা কারণে সমুদ্রকে আমরা আজ এই অবস্থায় দেখ্‌ছি।

সমুদ্রের স্রোত

একজন বড় লেখক বলেছেন—দুনিয়ায় জলের মত চঞ্চল আর কিছু নেই। জল একদণ্ডও স্থির থাকতে পারে না; তোমাদের স্কুলের সব চেয়ে দুষ্ট ছেলেও তার কাছে চঞ্চলতায় হার মেনে যাবে।

চঞ্চল জলধারাকে বলা হয়—স্রোত। স্রোত নদীর মত এঁকে-বেঁকে চলে যায়।

সমুদ্র স্রোতে ভরা। স্রোত বল্‌তে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা কিন্তু নয়। কোন স্রোত বরফের মত ঠাণ্ডা, কোনটা খুব গরম, আবার কোন কোনটার উত্তাপ আমাদের দেশের গঙ্গা বা পুকুরের জলের মত।

পৃথিবীর গরম অংশকে বলা হয়—টরিড জোন (Torrid Zone)। এই অংশের সমুদ্রের জলের তাপ দু রকম। ওপরের জল খুব গরম, নীচের জল গরম নয়। কারণ তলা দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা-জলের স্রোত অনবরত বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ দুটি চির তুষারে ঢাকা। এখানকার সমুদ্রের শত শত মাইল জায়গা জমে বরফ হয়ে আছে। এই দুই প্রদেশ থেকে ঠাণ্ডা জলের স্রোত বিষুবরেখার দিকে অনবরত বয়ে যাচ্ছে।

তোমরা হয়তো বলবে, সমুদ্রের তলা দিয়ে ঠাণ্ডা জলের

স্রোত বয়ে যায় কেন? ওপর দিয়ে বইলেই তো পারে।

কিন্তু তা পারে না। কারণ ঠাণ্ডা জল ভারী, গরম জল হাল্কা। তাই গরম জল ওপরে থাকে, ঠাণ্ডা জল থাকে তলায়।

মেরুপ্রদেশ থেকে যেমন ঠাণ্ডা জলের স্রোত আসছে, তেমনি আবার বিষুবরেখার দিক থেকে গরম জলের স্রোত মেরুপ্রদেশের দিকে বয়ে যাচ্ছে। বিষুবরেখায় সূর্য্যের তাপ প্রচণ্ড। সেই উত্তাপে জল গরম হচ্ছে। তাতেই হচ্ছে তপ্ত জলের স্রোতের সৃষ্টি। এই তপ্ত জলের স্রোতই বিষুবরেখা থেকে ঠাণ্ডাজলের স্রোতের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে।

তাহলেই বুঝতে পারলে, সমুদ্রে কি করে ঠাণ্ডা ও গরম জলের স্রোতের সৃষ্টি হয়। এখানে আর একটি কথা জেনে রাখা দরকার! সমুদ্রের সব অংশে স্রোত নেই, আর জল নীচু ছাড়া কখনও ওপর দিকে আপনা থেকে বয়ে যায় না। সমুদ্রগর্ভের ভূমির প্রকৃতিও স্রোত সৃষ্টির একটি কারণ।

আরও একটি কারণ সমুদ্রের জলকে নিয়ত চঞ্চল করে রেখেছে। সেটি হচ্ছে, সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জলের বাষ্পে পরিণত হওয়া।

দিনের বেলা রৌদ্রের তাপে সমুদ্রের ওপরকার জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়।

ওপরকার জল যেমনি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, অমনি তলাকার জল তার জায়গা দখল করে।

এ জলও আবার তপ্ত বাষ্প হয়ে উবে যায়। এর ফলে সমুদ্রের ভিতর খুব নড়াচড়া হয় এবং এই ভাবেই মহাসমুদ্র অনবরত উঠছে, নামছে, ঘুরছে, ফিরছে—কখনো কখনো ছুটে চলে যাচ্ছে—এক তিলও স্থির থাকছে না।

বাতাসের স্রোত

অনুকূল বায়ু

বাতাসের সঙ্গে সমুদ্রের বড় নিকট সম্বন্ধ। তাই সমুদ্রের বিষয় কিছু বলতে গেলে বাতাসের কথাও বলা দরকার।

বাতাসের মতও পরিবর্ত্তনশীল জিনিষ জগতে আর দুটি নেই।

তাই বলে যে বাতাসের গতির কোন নিয়ম নেই, তা কিন্তু নয়। বিনা কারণে ও বিনা নিয়মে সামান্য বাতাসও বয় না।

তাপে বাতাস গরম হয়। গরম বাতাস হাল্কা। হাল্কা বাতাস ওপর দিকে উঠে।

গরম বাতাস কি করে ওপর দিকে ওঠে জান? থামের মত গোল হয়ে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অর্থাৎ বিষুব রেখায় গরম বাতাস আকাশে উঠে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে যায়। আর তার শূন্য জায়গা পূর্ণ করতে পৃথিবীর দুই মেরু-প্রদেশ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসে। এই ভাবে পৃথিবীর আবহাওয়ার সমতা রক্ষা পেয়ে থাকে। এই ব্যাপার সর্ব্বদা চলছে।

আগেই জেনেছ, সমুদ্রের স্রোত বিষুব রেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ থেকে বিষুব রেখার দিকে নিরন্তর বইছে।

কোন বাধা-বিঘ্ন না পেলে বায়ুর স্রোতও উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সমান ভাবে প্রবাহিত হয়।

জিজ্ঞাসা করতে পার, পৃথিবীতে এমন কি আছে, যা বায়ুমণ্ডলের গতি-পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে? ঝড়ের গতিরোধ করে এমন শক্তি কার?

একটা বাধার কথা বলি, শোন। তোমরা ভূগোলে পড়েছ, পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের ওপর দিনে রাতে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। এর নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি।

তোমরা ভূগোলে এও পড়েছ যে, পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের ওপর ঘোরে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব্ব দিকে। এই ঘোরার ফলেই দিন ও রাত হয়।

পৃথিবীর কোন্ দিক থেকে বিষুব রেখার দিকে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বয়ে আসে একথা আগেই বলেছি। পৃথিবীর আহ্নিক গতিই এই স্রোতের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তার ফলেই বায়ু-স্রোত তার সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য পথে প্রবাহিত হয়।

পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব্বদিকে ঘোরে—সেইজন্য বায়ুর গতিও পশ্চিম মুখো হয়ে যায়।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে বাতাসের স্রোত বিষুব-রেখায় এসে পৌঁছাবামাত্র একটি স্রোতে পরিণত হয়ে পূর্ব্ব হতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।

এই বাতাসকে প্রাচীনকালের নাবিকেরা বলত—অনুকূল বাতাস বা Trade wind।

সেকালে যখন বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবন হয় নি, তখন নাবিকেরা সমুদ্রপারে বাণিজ্যে যেত পালের জাহাজে চড়ে। পালের জাহাজের গতি নির্ভর করে বাতাসের ওপর। এই বাতাস বইলেই তারা পাল উড়িয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করত বলে এর নাম হয়েছিল—ট্রেড্ উইণ্ড।

কলম্বস্ যখন আমেরিকার দিকে যাচ্ছিলেন তখন তিনি এই অনুকূল বাতাসের গতিপথ ধরেছিলেন।

আর একজন নাবিক এই অনুকূল বায়ু ভরে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন। তাঁর নাম ম্যাগেলীনস্ (Magelhaens)। ম্যাগেলীনস্ ছিলেন পর্তুগীজ। তিনি "একটী বৃহৎ শান্ত সমুদ্রের" উপর দিয়ে জাহাজ চালিয়েছিলেন।

সমুদ্রটি শান্ত বলে তার নাম দিয়েছিলেন—প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)।

কিন্তু এই অনুকূল বাতাসও বাধা পায়।

বড় বড় মহাদেশ অনুকূল বায়ুর গতি রোধ করে।

এ বাতাস বৎসরে ছ'মাস এক পথে আর ছ'মাস অন্য পথে প্রবাহিত হয়। অনুকূল বায়ু ভারত মহাসাগরে এসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তখন এই বাতাসকে মৌসুমী বায়ু বা the monsoon বলে।

অনুকূল বায়ু কেন যে সব সময়ে একই পথে প্রবাহিত হতে পারে না, এর কারণ তোমাদের বলছি। এর কারণ, অনুকূল বায়ু-স্রোত মাঝে মাঝে বায়ুস্তম্ভের দ্বারা প্রতিহত হ'য়ে অন্য পথে চালিত হয়।

আমাদের দেশে কোন্ সময়ে মৌসুমী বায়ু বয় তোমরা জান।

মৌসুমী বায়ু বৎসরে ছ'মাস উত্তর-পূর্ব্ব হ'তে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

এসিয়া মহাদেশের সমুদয় ভূভাগ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাতাসও তাতে গরম হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে তলাকার স্থান বাতাসশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে কোন জায়গা বাতাস-শূন্য হয়ে থাক্‌তেই পারে না। বিষুবরেখা থেকে তখন গরম বায়ুর স্রোতে সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে ছোটে।

সেই সময় এই বায়ু-স্রোতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব্ব থেকে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর ধাক্কা লাগে। তার ফলে, মৌসুমী বায়ুর গতি-পথ পরিবর্ত্তন হয়ে তা উত্তর পূর্ব্বের পরিবর্ত্তে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হ'তে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ হয় না।

যখন পরিবর্ত্তন হবার সূত্রপাত হয়—তখন আবহাওয়ার মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব আসে। আমাদের দেশে চৈত্র-

সমুদ্রের রহস্য

বৈশাখ মাসের বেলা শেষে কাল-বৈশাখীর রুদ্র মূর্ত্তি ও প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড তোমরা সকলেই দেখেছ। কাল-বৈশাখী হল, মৌসুমী বায়ুর অগ্রদূত। এর পর জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে আকাশে নব-বর্ষার মেঘ সঞ্চার হয়, বর্ষণের আশায় পৃথিবী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

উষ্ণ জলের স্রোত

[The gulf stream]

জাহাজ চলেছে। সমুদ্র বেশ ঠাণ্ডা; চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ বুঝতে পারা গেল্ একটা উষ্ণ জলের স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছি। ভারী আশ্চর্য্যের নয়? কিন্তু কারণটা জানতে পারলে দেখবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

উষ্ণ জলের স্রোত কখনও সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় না। এই স্রোতের রংও বিভিন্ন। কোন কোন জায়গা গাঢ় নীল।

দুই তটের মধ্য দিয়ে যেমন নদীর স্রোত বয়ে যায়—দুই কূলে যেমন তার ঢেউ এসে লাগে—ঠিক তেমনি ভাবেই সমুদ্রের এই গরম জলের স্রোতও তার দুই দিকের ঠাণ্ডা জলের স্রোতকে স্পর্শ করতে করতে ঢেউতুলে ছুটে চলে। এক এক সময় এমনও হয় যে একখানা জাহাজের অর্দ্ধেক থাকে উষ্ণজলের স্রোতে অপর অর্দ্ধেক থাকে ঠাণ্ডা জলের স্রোতে।

এই জলের স্রোত এত বেশী গরম যে কোন জাহাজ তার মধ্যে এসে পড়লেই নাবিকেরা মনে করে, যেন হঠাৎ হিমের দেশ থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসে পড়েছে।

হয়তো এমন হোল, কোন জাহাজের নাবিকেরা ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং দারুণ শীতে তাদের শরীর জমে যাবার মত। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের

আশঙ্কা হচ্ছে, ঠাণ্ডায় এখনই মৃত্যু হবে। ঠিক এমনি সময়ে তারা হঠাৎ গরম জলের স্রোতের মধ্যে এসে পড়লো। তখন কোথায় ঝড়ের ক্লান্তি আর কোথায় শীত! গরমে তাদের শরীরে আবার রক্ত চলাচল সুরু হল; সকলে তাজা হয়ে উঠল। তাদের জাহাজখানাও রক্ষা পেল, তারা নিজেরাও বাঁচল।

এই গরম জলের স্রোতকে বলা হয়—উপসাগরের স্রোত (Gulf stream)। কারণ এর সুরু সুদূর আমেরিকার সেই মেক্‌সিকো উপসাগরে। সেখান থেকেই এই উষ্ণ স্রোতধারা বয়ে আসে।

মেক্‌সিকো উপসাগর উত্তপ্ত স্রোত ও নদীজলে পূর্ণ। এই উগসাগরটি যেন একটি ফুটন্ত কড়া। এখান থেকে সমুদ্রের যাবতীয় উষ্ণ জলের স্রোত তীব্র বেগে সমুদ্রের বুকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

এই স্রোত ধারাটি সমুদয় উত্তর আমেরিকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সারা আটলাণ্টিক মহাসাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এর একটা ধারা ইউরোপের পূর্ব্ব উপকূল ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিষুবরেখায় ঘুরে এসেছে।

এই স্রোতটি মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে ভ্রমণ করেছে প্রায় ২০,০০০ মাইল।

মেক্সিকো উপসাগর—এখান থেকেই উষ্ণজলের স্রোত আরম্ভ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাছেরা এই স্রোতে বাস করে। তারা এই স্রোত ছেড়ে কোথাও যায় না—কারণ এর বাইরে গেলেই দারুণ ঠাণ্ডায় তাদের অনিবার্য্য মৃত্যু। এই গরম স্রোতের পথ ধরে তারা শীতপ্রধান দেশেও যাতায়াত করে।

এই গরম জলের স্রোতই আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনেকাংশ উত্তপ্ত করে রেখেছে।

ফ্রান্সের এমন সব মনোরম উপকূল আছে, যেখানে রোগীরা চিরকাল গ্রীষ্মসুখ উপভোগ করে। এর কারণ ঐ উষ্ণ জলের স্রোত।

এই উষ্ণ জলের স্রোত ইংল্যাণ্ডের উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলেই ইংল্যাণ্ডও লোকের বাসযোগ্য। তা না হলে উত্তর মেরুর বরফের দেশের মতই দেশটি তুষার মরুতে পরিণত হত।

চির-তুষারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশের মাঝে মাঝেও তরল চঞ্চল সমুদ্রাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। হিমে এখানকার জলভাগ জমে যাবার কথা। কিন্তু উষ্ণ জলের স্রোত উত্তর মেরুর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় জায়গায় জায়গায় জল জমতে পারে নি, তরলই রয়ে গেছে।

গতিহীন বা শান্ত সমুদ্র

[The motionless sea]

জিজ্ঞাসা করতে পার, 'একটু আগেই পড়েছি সমুদ্র নিয়ত চঞ্চল, তা যদি হয় ; তাহলে আবার সমুদ্র "গতিহীন বা শান্ত" হবে কি করে ?' প্রশ্নটি ঠিক। কিন্তু গোটা সমুদ্রের কথা বল্‌ছি না ; বল্‌ছি তার কোন একটি বিশেষ অংশের কথা।

তোমরা মরুভূমির কথা শুনেছ। এ যেন সমুদ্রের মরুভূমি। এই অংশকে 'মরু জল' বলাই বোধহয় ঠিক। সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ যাতায়াতের যে সকল পথ আছে মরু-সমুদ্র তার বাইরে পড়ে।

জনহীন সমুদ্রে নাবিকেরা বড়ই নির্জ্জনতা অনুভব করে। সুতরাং সমুদ্রের নানাজাতীয় পাখী যদি তাদের জাহাজের মাস্তুলে ও কেবিনের ছাদে উড়ে এসে বসে, তারা বেশ খুসী হয়। এই সকল পাখীও নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত যায়।

কিন্তু জাহাজ মরু-সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়লেই—পাখীরা হঠাৎ উড়ে চলে যায়।

তখন জাহাজ যেন মৃত্যুর রাজ্যে এসে পোঁছয়। বাতাসের গতি বন্ধ হয়—পাখীর গান থেমে যায়—ঢেউএর শব্দও শোনা যায় না !

এই ভয়ঙ্কর জায়গাটি কোথায় জান? দক্ষিণ দিককার সমুদ্রে।

দুই বিপরীত দিক হ'তে প্রবাহিত দুটি জলস্রোতের মাঝখানে এই সমুদ্র অবস্থিত।

একটি হচ্ছে দক্ষিণ মেরুর বরফ জলের স্রোত। এই জলস্রোত এমন ঠাণ্ডা ও ভারী যে, এর সমুখে উষ্ণ জলের স্রোত এগোতেই পারে না। কোন পশু-পক্ষীও এই জলে বাস করতে পারে না।

আর একটি হচ্ছে বিষুবরেখা থেকে প্রবাহিত উষ্ণ জলস্রোত। এই স্রোতটি যেমন গরম তেমনি হাল্কা ও সুখকর।

প্রথমটি চলেছে—বিষুবরেখার দিকে, দ্বিতীয়টি চলেছে—দক্ষিণ মেরুর দিকে। একটি জায়গায় এসে দুটিতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে। এইখানে দুটিরই গতি স্থির এবং ঠিক এই-খানেই সৃষ্টি হয়েছে মরু-সমুদ্রের।

সমুদ্রের ঝড়

[CYCLONE]

সমুদ্রের ঝড়কে নাবিকেরা যত ভয় করে এমন আর কিছুকে নয়।

আজকালকার দিনে সমুদ্রের উপকূলে আবহাওয়া অফিস থেকে ঝড়ের সঙ্কেত দেওয়া হয়। তাতে করে জাহাজের নাবিকেরা বুঝতে পারে কখন ঝড় হবে।

কাজেই ঝড় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তারা সমুদ্র-পথে যাত্রা করে না।

কিন্তু সীমাহীন সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়লে নাবিকেরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারে—ঝড় কি!

ইংরেজীতে সমুদ্রের এই ঝড়কে বলে সাইক্লোন—আমরা বাংলায় বলি ঘূর্ণিবাত্যা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পদ্মার চরে ঘূর্ণিবাতাস দেখেছ। এর পরিধি কতটুকুই বা! কিন্তু তাই দেখেই প্রাণে আতঙ্ক জাগে। মনে কর এর পরিধি যদি ৪০।৫০ মাইল হত? সমুদ্রে যে ঝড় ওঠে তার এক একটার পরিধি ৪০।৫০ মাইল হয়ে থাকে। পদ্মার চরে ঘূর্ণিবাতাসকে যে বেগে ঘুরতে দেখ, এই ঘূর্ণিবাতাসের বেগ তার চেয়ে অন্ততঃ ত্রিশ গুণ বেশী। এই ঝড় প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে

ঘুরতে এগিয়ে চলে। সে সময়, সমুখে যা পায় তাকেই ভেঙে-গুঁড়িয়ে,উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যার মুখে জাহাজ পড়লে তার অবস্থাটা যে কি হয় তা বেশ বুঝতে পারছ!

মনে কর একখানি জাহাজ গভীর সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তভাবে চলেছে; এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল,ক্রমে সেই মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে অন্ধকারে চারধার ঢেকে ফেললে। সেই সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ভীষণ বেগে ঝড় বইতে লাগলো। তখন জাহাজখানির অবস্থা কি হবে কল্পনা কর দেখি।

তার চারধারে পাহাড়ের মত উঁচু কালো রঙের ঢেউ। এক একটা ঢেউ এসে জাহাজখানাকে মাথায় তুলে সোলার টুকরোর মত নাচাচ্ছে; বাতাসের বেগে মড় মড় শব্দে মাস্তুল ভেঙে পড়ছে, ফড় ফড় শব্দে পাল ও দড়ি-দড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে, ডেকের ওপর দিয়ে ঢেউ ছুটে চলেছে। সেই ধাক্কায় জাহাজের ওপরে যা কিছু আছে, সব ভেসে সমুদ্র-গর্ভে গিয়ে পড়ছে।

এই ভয়ঙ্কর বিপদের কবল থেকে উদ্ধারের উপায় কি? কেবল প্রাণপণ শক্তিতে যুঝে চলা। এখানে কোন কৌশল খাটে না, নাবিকেরা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ঝড়ের সঙ্গে যুঝে চলে। যদি বরাত ভাল থাকে, বেঁচে যায়!

ঘূর্ণিবাত্যার মুখে পড়ে কত জাহাজ যে ডুবে গেছে তার সীমা নেই। এই জন্যে নাবিকদের বড় সাবধানে জাহাজের ঘূর্ণিবাত্যা এড়িয়ে চলতে হয়!

সমুদ্রের মরীচিকা

কথাটা বড় আশ্চর্য্যের ; কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। কেননা মরীচিকা আলোর খেলা মাত্র। মরুভূমির মত সমুদ্রের বুকেও মাঝে মাঝে মরীচিকা দেখা দিয়ে নাবিকদের ভুল ঘটায়।

অনেকদিন আগের ঘটনা বলছি। একবার সমুদ্রের ওপর দিয়ে দুখানা জাহাজ চলেছে। তাদের একখানি বড় ; অন্যখানি ছোট। হঠাৎ দিকচক্রবালে একখণ্ড কটা রঙের মেঘ দেখা দিল। দেখতে দেখতে সেখানা ছুটে এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেললে ; সেই সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলে প্রবল বাতাসে নেচে উঠল। নাবিকরা বুঝল, ঘূর্ণিবাত্যার তাণ্ডব সুরু হয়েছে। তারা প্রাণপণ শক্তিতে ঝড়ের সঙ্গে যুঝে চল্‌ল। এক এক সময় মনে হয়, এই বুঝি তাদের সকলের সলিল সমাধি হবে। কিন্তু শেষ অবধি নিতান্ত ভাগ্যবলে বড় জাহাজখানি রক্ষা পেল, কিন্তু ছোটটির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সমুদ্র আবার আগের মত শান্ত হয়েছে। বড় জাহাজের কাপ্তেন ভাবলেন, ঝড়ের বেগে ছোট জাহাজটি হয়ত দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছে, দু এক দিনের মধ্যেই তার দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপর তাঁরা অনেক দিন ও অনেক জায়গায় সন্ধান করলেন, তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না।

বড় জাহাজখানা ত ছোটখানার সব আশা ছেড়ে দিয়ে আপন গন্তব্য পথে চলেছে। কিন্তু সেদিন আকাশ পরিষ্কার ও নীল, সমুদ্র শান্ত নীল রৌদ্রে ঝলমল করছে। বড় জাহাজের একটী নাবিক বল্লে—দূরে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

জিনিষটার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে তার মনে হল, সেটা একখানা জাহাজের ভাঙ্গা অংশ, তার ওপরে জন কয়েক মাঝি-মাল্লারা বসে আছে। কাঠখানা যেন ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কেবল তাই নয়, লোকগুলো কাঠের ওপর বসে তাদের উদ্ধার করবার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকচে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হোল—ওটা তাদের সেই ছোট জাহাজখানার ভাঙা অংশ।

জাহাজের অধ্যক্ষও গ্যাংওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেটাকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরও ধারণা হল, সেটা সেই নিরুদ্দিষ্ট জাহাজেরই অংশ; তার ওপর জনকয়েক নাবিক বসে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধারের জন্যে একখানা বোট পাঠালেন।

কিন্তু বোটখানি সেদিকে যতই এগোয় ততই তার নাবিকদেরও মনে হয়, তারাও যেন মাল্লাদের করুণ কাতরধ্বনি শুনতে পাচ্চে—যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কতকগুলি লোক কাঠের ওপর বসে হাত বাড়িয়ে তাদের উদ্ধার করবার জন্যে নাবিকদের ডাকছে।

বোটের নাবিকরা ভাবলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা

ওদের লোকগুলোকে উদ্ধার করবে—কিন্তু শত চেষ্টায়ও কাঠখানার কাছে তারা পৌঁছতে পারে না; তাদের ও কাঠের মাঝের ব্যবধানটা ঠিক তেমনই রয়ে যায়। শেষে তারা বুঝতে পারলে, জিনিষটা কাঠ নয়—মরীচিকা। কাছাকাছি তীর থেকে—ঝড়ের বেগে কতকগুলি গাছ উপড়ে সমুদ্রে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। ওর ওপর লোকজন কিছুই নেই।

তারা ব্যথিত মনে জাহাজের দিকে ফিরে চল্‌ল।

সেই হারানো জাহাজখানার কথা আর কখনো শোনা যায় নি।

বায়ুস্তম্ভ ও জলস্তম্ভ

বায়ুস্তম্ভ যেমন ভীষণ জলস্তম্ভও তেমনি।

ঘূর্ণি বাতাসের প্রচণ্ড বেগে সমুদ্র বুক থেকে জলরাশি থামের মত গোল হয়ে ওপরে ওঠে। এরই নাম জলস্তম্ভ। কখনো কখনো এই জলরাশিকে প্রকাণ্ড তেলের কুপির মতও (funnel) দেখায়। কেবল যে ঘূর্ণিবাতাসেই জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা নয়; অন্য কারণেও তার সৃষ্টি হয়।

কোন জাহাজ এই জলস্তম্ভের মধ্যে গিয়ে পড়লে তার আর নিস্তার নেই। জলরাশি তখন তাকে নিজের গর্ভের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। জাহাজের নাবিকেরা সবিস্ময়ে দেখে, তাদের চারিদিকে ঘন অন্ধকার; কিন্তু মাথার ওপর তলোয়ারের ফলার মতো আলো ঝক্‌ঝক্ করছে; চারধারে বজ্রধ্বনির মত ভয়ঙ্কর শব্দ। নাবিকেরা এই অবস্থাকে বলে "ঝড়ের চক্ষু" (the eye of the storm)।

যখন মাথার ওপরে ঘন কাল মেঘ লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে গর্জ্জন করে ও তার এক অংশ লাট্টুর নালের মত সরু হয়ে কিছু নীচে নেমে আসে, সেই সঙ্গে চারধার অন্ধকারে ছেয়ে যায়, প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে এবং ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হতে থাকে তখনই জলস্তম্ভের আবির্ভাব হয়ে থাকে। জলস্তম্ভ এত উঁচু হয় যে তার মুখ গিয়ে আকাশে মেঘের লাট্টুর মত মুখকে স্পর্শ করে। অবস্থাটা হয় কতকটা

চুম্বকের মত। আকাশের মেঘ যেন চুম্বকের মত সমুদ্রের জলকে টেনে ওপরে তোলে। আকাশ ও সমুদ্র ব্যেপে তখন

জলস্তম্ভ

মেঘে, বাতাসে ও জলস্তম্ভে ভীষণ নাচানাচি ও দাপাদাপি সুরু হয়। জলের ফেনায় সমুদ্র সাদা হয়ে যায়।

এর মধ্যে জাহাজ পড়লে কি আর তার রক্ষা আছে ? তবে সুখের বিষয় এ রকম জলস্তম্ভ প্রায়ই দেখা যায় না।

এর মাঝ থেকে যদি কোন জাহাজ নিস্তার পায়, তাহলে তার ভাগ্য বলতে হবে। বাতাসের বেগে জাহাজখানা যদি ওপরে উঠে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্যে ওপরে একই অবস্থায় থাকে তাহলেই তার রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু তারপর জাহাজখানার অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়। ঝড়ের দাপটে ও জলের ঝাপটায় হয় তার মাস্তুল ভগ্ন, কেবিন ছাদহীন, দড়ি-দড়া ছিন্ন।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে—"জলস্তম্ভ ও বায়ুস্তম্ভ কি একই প্রকারের ?"

—না, ঠিক এক রকমের নয়।

তরঙ্গাবর্ত্ত

পৃথিবীর এক এক অংশের সমুদ্রে খুব বেশী ঢেউ হয় এবং সেখানকার এক একটা ঢেউ হয় খুব উঁচু। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ঢেউ হয় না বল্লেই চলে।

অনেক নদীর মোহনার মুখ খুব চওড়া: তার এপার-ওপার দেখা যায় না।

যখন সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ এই সকল নদীর মোহনা দিয়ে ওপর দিকে অর্থাৎ উজানে চলে, তখন প্রায়ই নদীর ওপর দিক থেকে নিম্নগামী ঢেউয়ের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হয়।

সেই সংঘর্ষে সমুদ্রের ঢেউগুলি নদীর ওপরের দিকের নিম্নগামী ঢেউকে বহুদূরে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

এ থেকেই তরঙ্গাবর্ত্তের সৃষ্টি।

তরঙ্গাবর্ত্তের মাঝে কোন নৌকো পড়লে তার আর বিপদের সীমা থাকে না।

কখন কখন এক একটি ঢেউ হয় ৩০ ফিট উঁচু এবং প্রায় ৪ মাইল লম্বা। আর তার রং হয় সাদা; দেখে মনে হয় যেন চূণের প্রাচীর। ঢেউগুলো দ্রুতগামী রেলগাড়ীর মত বেগে ছুটতে থাকে।

তরঙ্গাবর্ত্ত

তখন সমুখে নৌকো, জাহাজ যা পায়, সবই ভেঙ্গেচূরে, ডুবিয়ে, ভাসিয়ে নিজের পথ করতে করতে চলে যায়।

তরঙ্গাবর্ত্ত কতকটা বন্যার মত। বন্যার সময় নদী যেমন ফুলে উঠে ওপর দিকেও চলে তরঙ্গাবর্ত্তও তেমনি ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু যতই ওপরে ওঠে ততই তার বেগ ও ভীষণতা কমে যায়। অবশেষে এক জায়গায় গিয়ে তার বেগ আর থাকে না, নদী-জলের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তরঙ্গাবর্ত্তের কবলে পড়ে কেবল যে নৌকো বা জাহাজই বিধ্বস্ত হয়, তা নয়, অনেক সময় তীরের গাছপালা ও ঘরবাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে গঙ্গা নদীতে তোমরা হয়তো বান দেখেছো। তরঙ্গাবর্ত্ত অনেকটা বানের মত; কিন্তু তার ভীষণতা ও বেগ বানের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আমাদের দেশে বানের মুখে পড়েই কত নৌকো বানচাল হয়ে যায়। সুতরাং তার চেয়ে যে তরঙ্গাবর্ত্তের ভীষণতা হাজার গুণ বেশী, তার মুখে পড়ে যে জাহাজ-নৌকো বিধ্বস্ত হবে, নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি থাকতে পারে?

এই ঢেউ যে কখন হয় তা কিছু বলা যায় না। কোথাও কিছু নেই, নদী খুব শান্ত হঠাৎ দৈত্যের মত সমুদ্রের এই বান

১৮৪৬ সালে বরবন্ দ্বীপে তরঙ্গাবর্ত্ত

এসে হাজির। সেই সঙ্গে ঘন ঘন গম্ভীর নির্ঘোষ উঠছে। বহুদূরে সাদা সাদা ফেনার রেখা দেখা যাচ্ছে। এই সাদা সাদা ফেনার লাইন জলের স্রোত ও বড় বড় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

লোকে যদি দেখে যে তরঙ্গাবর্ত্ত উঠেছে, তাহলে তাদের আর ভয়ের সীমা থাকে না।

নদীতে যারা থাকে তারা একেবারে নিরুপায়। কেননা তাদের জাহাজ-নৌকো তারা কোথায় সরাবে? তীরের যারা, তারাও বাড়ী-ঘর ফেলে পালায়। তরঙ্গাবর্ত্ত শান্ত হলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তা বড় করুণ। দুই তীরে বাড়ী ঘর ও গাছ-পালার চিহ্ন নেই। জলে জাহাজ ও নৌকার ভগ্নাংশ-গুলি, বাড়ী-ঘরের নানা অংশ, মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ভাসমান মৃতদেহ, আর তার ওপর উড়ছে গলিত মৃতদেহ-লোলুপ শকুনের দল!

তরঙ্গাবর্ত্ত চীন ও আমেরিকার বড় বড় নদীর মোহনায় প্রায়ই দেখা যায়।

প্রায় ১৩৩ বছর আগে লিস্‌বন সহরটী একটি তরঙ্গাবর্ত্তে পড়ে ভেসে গিয়েছিল।

তরঙ্গাবর্ত্তের সঙ্গে কিন্তু সাধারণ তরঙ্গ বা ঢেউএর বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই।

সমুদ্রের আগুন (?)

'সমুদ্রের আগুন' শুনে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ ; ভাব্ছ সে আবার কি ? এ সত্য হতে পারে না।

সত্যই সমুদ্রের ঢেউএর ওপর আগুন নাচতে থাকে। দৃশ্যটি বড় সুন্দর। দেখলে কিছুতেই ভোলা যায় না।

বড় হলে তোমরা যখন সমুদ্র-যাত্রা করবে, তখন এরকম কত সব মজা দেখতে পাবে।

সমুদ্রের আগুনের রঙ নীল ও গাঢ় লালে মিশানো ; তার গায়ে এদিকে-ওদিকে আবার ফিকে লাল রঙ। সমুদ্রের চঞ্চল বুকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুনটা নাচতে থাকে।

তোমরা ভাব্ছ, এর মধ্যে জাহাজ পড়লে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না। কেননা এর তেজ নেই। এ আগুনের মধ্য দিয়ে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলে যায়।

কিন্তু কিসে জলে আগুন জ্বলে ? এমন একটা জিনিষের গুণে জ্বলে যা জলেও পাওয়া যায়, স্থলেও পাওয়া যায়।

এই জিনিষটিকে ইংরাজীতে বলে ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus)।

ফস্‌ফরাস্ সাংঘাতিক বিষ। দেখতে অনেকটা সাদা মোমের মত। জিনিষটা এমন দাহ্য যে, একটু ঘর্ষণেই এ থেকে আগুন বেরোয়। এজন্য ব্যবসায়ীরা জিনিষটাকে জলের মধ্যে পূরে রাখে—নইলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

ফস্‌ফরাসকে জল থেকে বার করলেই বাতাসের সংস্পর্শে এসে তা থেকে ধোঁয়া বেরোয় এবং কিছুক্ষণ পরেই জ্বলতে
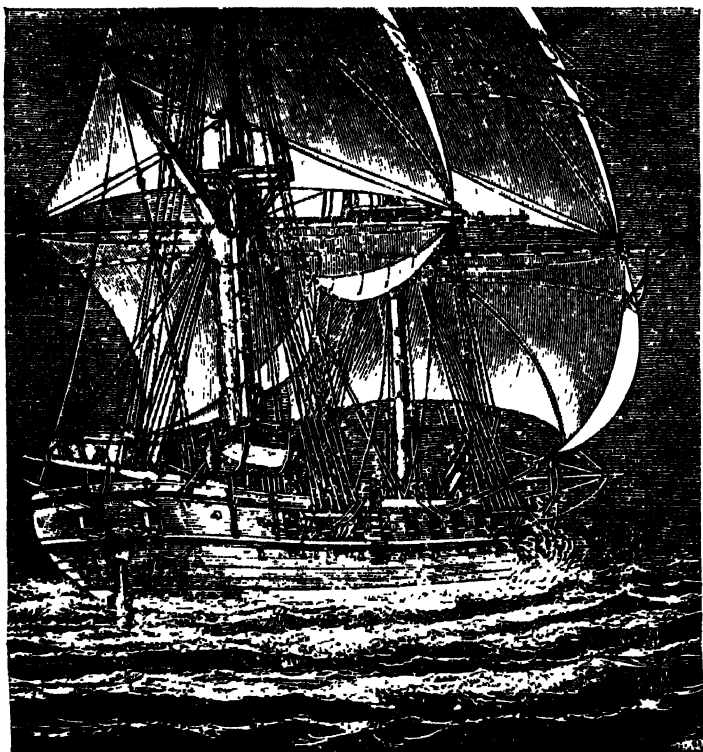
উজ্জ্বল সমুদ্র

আরম্ভ করে। ফস্‌ফরাসে হাত পুড়ে গেলে ভারী যন্ত্রণা হয়—আর সে ঘা সহজে সারে না!

চট্‌পটি বলে একরকম বাজী আছে, তোমরা সকলেই

দেখেছো। একটুকরো চট্‌পটি মাটিতে বা দেওয়ালে ঘসলেই চট্‌পট্‌ শব্দ হয়, আর তা থেকে আগুন বেরোয়। এর কারণ আর কিছু নয়, জিনিষটার সঙ্গে ফস্‌ফরাসের অংশ আছে। ঘর্ষণে তাই জ্বলে ওঠে।
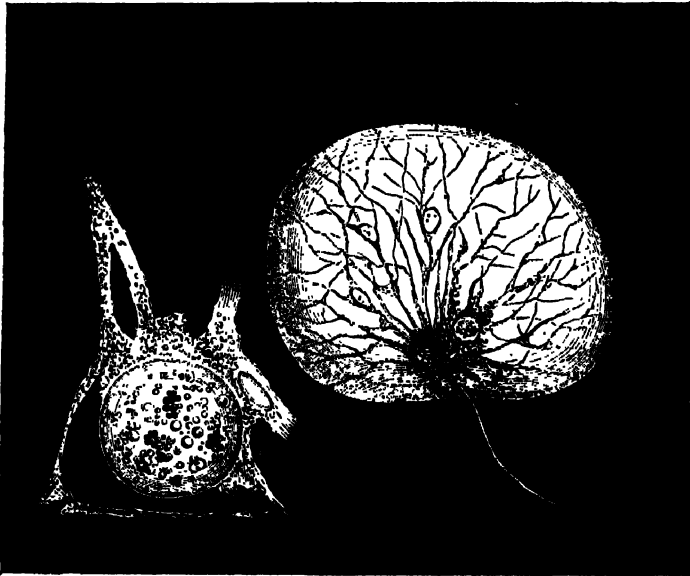
আলো প্রদানকারী কীট। (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট)

অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে এই ফস্‌ফরাস্‌ জ্বলতে থাকে। তাই সমুদ্র রাত্রে জ্বল জ্বল করে।

কিন্তু সমুদ্রে এর উৎপত্তি হয় কি ভাবে? সমুদ্রে এক রকম জীব আছে, তাদের গায়ে ফস্‌ফরাস্‌ থাকে। এই সব

জীবের মধ্যে এমন এক রকম জীব আছে, যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন খালি চোখে দেখা যায় না। এই সব কীটাণু যখন কোটি কোটি একত্র হয়, তখনই সমুদ্রে ঐ আগুনের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এই সকল কীটাণু ছাড়াও সমুদ্রবাসী অন্যান্য অনেক জীবের গায়ে ফস্‌ফরাস্ আছে। একরকম মাছ আছে তাকে বলা হয় তারা মাছ (Star fish)। মাছগুলো দেখ্‌তে তারা বা সূর্য্যের মত। এই মাছগুলোর গায়েও ফর্‌ফরাস্ আছে। আবার এমন অনেক রকম কোমল দেহ প্রাণী সমুদ্রে বাস করে, যাদের গায়েও ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায়। একরকম কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ আছে, যাদের গা থেকেও ফস্‌ফরাসের আগুন বেরোয়। এই সব প্রাণীর গা থেকেই আলো বেরিয়ে অনেক সময় সমুদ্র আলোকিত করে।

ঈল নামে একরকম বৈদ্যুতিক মাছ (electric eel) আছে। তাদের গা' থেকে বিদ্যুতের আলো বেরোয়। ইলেকট্রিক ঈলের আরও একটা শক্তি এই যে, এরা শত্রুকে ইলেকট্রিকের শক্ দিয়ে কাবু ত করে ফেলেই, শত্রু যদি ক্ষুদ্র দেহবিশিষ্ট হয়, তাহলে শকের ফলে তার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটায়। একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই মনে জাগছে—মানুষের কিছু হয় কি? হয়। মানুষও কাবু হয়ে পড়ে। এই ইলেট্রিক কি করে এদের শরীরে উৎপন্ন হয়, তা আজও ভাল করে জানা যায় নি।

স্পঞ্জের জন্য সমুদ্রে অবতরণ

এক রকম সামুদ্রিক কীট আছে যাদের বলা হয় সী-অ্যানিমোন্ (Sea-anemone)। কীটগুলো খুব ছোট ; খালি চোখে এদের ভাল দেখাই যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে এদের মুখ, পাকস্থলী এবং স্পর্শ অনুভব করবার অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। এদের গা' থেকে এক রকম চট্‌চটে তরল পদার্থ বার হয়। এই তরল পদার্থে ফস্‌ফরাস্ আছে। দুধের মধ্যে যদি এই কীটাণুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে দুধে এমন আলো জ্বলে ওঠে যে, সেই আলোয় বসে অনায়াসে লেখাপড়া করা যেতে পারে।

প্রাণীগুলো নিজেদের দরকার মত আলো জ্বালতে ও নেবাতে পারে।

সামান্য চঞ্চল হলেই এদের গা' থেকে আলো জ্বলে উঠে ; আবার স্থির হলেই আলো নিবে যায়।

সমুদ্রের ধারে যারা বেড়াতে গেছ, তারা নিশ্চয়ই দেখেছ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় নীলাভ জ্যোতি ফুটে ওঠে, তীরেও যেখানে ঢেউ এসে পড়ে সেখানে ঢেউ সরে গেলে বালির ওপর আগুনের কণা জ্বলতে থাকে। ঐ জ্যোতি ও আগুনের কণা ফস্‌ফরাস্ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমুদ্রের প্রাণী

স্পঞ্জ

স্পঞ্জ আমাদের নানা কাজে লাগে। জিনিষটা তোমরা অনেকেই দেখেছ।

বহুকাল থেকে মানুষ মনে করে আসছিল—স্পঞ্জ উদ্ভিদ জাতীয়; স্পঞ্জের চেতনাও নেই, গতিও নেই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা একে প্রাণীজগতের খুব নীচের স্তরে স্থান দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, স্পঞ্জ উদ্ভিদ নয়, প্রাণী।

এদের সমস্ত শরীর খুব ছোট ছোট কাঁটায় ছাওয়া যেন একখানি কাঁটার জাল। এই কাঁটাজালের আগাগুলো নিরেট নয়। প্রত্যেক কাঁটায় এক একটি মুখ বা পথ আছে। এই কাঁটাজালের চারপাশে যে চটচটে পদার্থ থাকে, সেইগুলিই জীবন্ত স্পঞ্জ।

স্পঞ্জরা কখনো নড়ে না। যেখানে এরা জন্মায়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেইখানেই বাস করে। স্পঞ্জ কি করে খায় জানো? সমুদ্রের জলে খুব ছোট ছোট এক রকম পোকা বাস করে, তাই ক্ষুধার সময় এরা সমুদ্রের জল মুখ দিয়ে টেনে নেয়। তারপর সেই জল আবার ছেড়ে দেয়। তাতে কীটাণুগুলো মুখের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। তাই খেয়েই এরা বাঁচে।

এবার তা'হলে বেশ বুঝতে পারছ—এদের জীবন-যাত্রা কত নিম্নস্তরের।

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ, এক একটা স্পঞ্জের কত ডাল-পালা থাকে। এদের গায়েই ছোট ছোট স্পঞ্জ জন্মায় এবং তাতেই বৃদ্ধি পায়। এগুলি যখন খুব বড় হয়ে ওঠে তখন তাদের পৈত্রিক গাত্র থেকে খসে পড়ে। সেই সময় তাদের সমস্ত শরীর চুলের মত পদার্থে ছেয়ে যায়। তারা এরই সাহায্যে কিছুদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়—তারপর সমুদ্রের নীচে কোথাও খুব স্বল্প জলে এসে পৌঁছয় এবং সেইখানেই চির জীবনের মত শিকড় গেড়ে নেয়। কিন্তু তখনো তাদের চুলগুলি খুব দ্রুত ভাবে নড়তে থাকে এবং ক্রমে বেশ দৃঢ় ভাবে মাটিতে আটকে যায়। তখন থেকেই স্পঞ্জের ও তার চুলগুলির আস্ফালন চিরকালের জন্য আর একবারও দেখা যায় না; সব স্থির হয়ে আসে।

এই সকল ছোট ছোট স্পঞ্জের পরিবর্ত্তন ক্রমে আরম্ভ হয়। তার সারা গায়ে ছোট ছোট দাগ দেখা দেয় এবং এই দাগগুলি ক্রমশঃ তার বাইরের আঁশে পরিণত হয়ে যায়।

এই আঁশের মধ্যে তিন রকম জিনিষ আছে—চুন, কাঁটা এবং পাথরের মত এক রকম শক্ত পদার্থ। এই সবগুলোর উপাদান সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া যায়। ঐ আঁশ তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তার শরীরও একটু একটু করে বাড়তে থাকে। স্পঞ্জের মুখের বা গায়ের চার পাশের যে চট চটে পদার্থের কথা আগে বলেছি,

সেটাই স্পঞ্জের প্রাণীঅংশ। এর সারা দেহে কাঁটাজাল

একটী স্পঞ্জের উপরে প্রবালের শাখা প্রশাখা

বা তাদের মুখকে ঠিক প্রাণীঅংশ বলা চলে না

স্পঞ্জের প্রাণীঅংশকে সমুদ্রের জল থেকে তুললেই তেলের মত জিনিষে পরিণত হয়ে তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়। সেইজন্য স্পঞ্জকে জল থেকে জীবিত অবস্থায় তোলা এক রকম অসম্ভব।

নানা রকম রং ও আকৃতির স্পঞ্জ দেখা যায়। এক রকম স্পঞ্জ আছে, তাদের বলা হয় 'নেপচুনের দস্তানা'। এই গুলোকে দেখতে ঠিক হাতের মত। এই জন্যেই এর এই নাম। নেপচুন হলেন, জলদেবতা। জলদেবতাকে আমরা বলি—বরুণ।

বরুণের (নেপচুনের) দস্তানা

জিনিষটা যখন হাতের মত দেখ্‌তে, তখন বরুণ ছাড়া আর কার হাতের মত হবে ?

আমরা সাধারণতঃ যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি, তা জীবন্ত অবস্থায় দেখতে বড় কদাকার। এদের ওপরটা ঘন কালো এবং তলাটা ময়লা রকমের সাদা। এরা সমুদ্রের তলায় পাহাড়ের ওপরে জন্মায়। এদের তুলে আনতে গেলে ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে আসতে হয়। লোকে মুক্তার জন্যে যেমন সমুদ্র-গর্ভে ডুবুরি নামায় তেমনি স্পঞ্জের জন্যেও ডুবুরি নামিয়ে থাকে।

সমুদ্র তীরের কাছে এক রকম স্পঞ্জ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—লোকে তা ছিপের সাহায্যে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু তার দাম খুব কম। ভাল স্পঞ্জ সমুদ্রের গর্ভে ভিন্ন পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের গর্ভ থেকে স্পঞ্জ তুললেই এর প্রাণীঅংশ নষ্ট হয়ে যায়। তখন এর কঙ্কালকে শুকিয়ে কাজের ও ব্যবসার উপযুক্ত করা হয়।
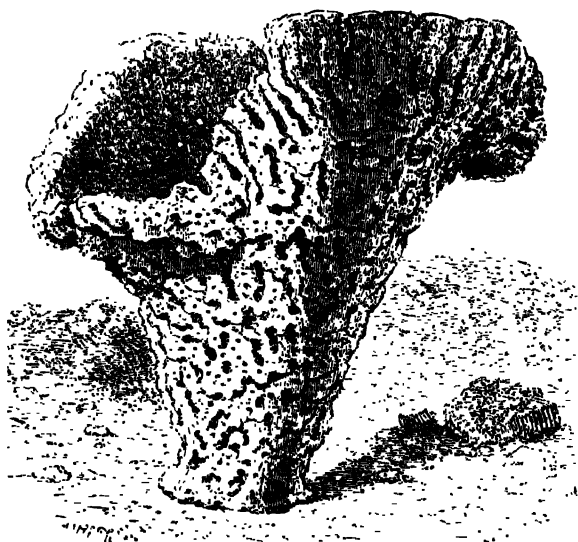
আর এক প্রকারের স্পঞ্জ

কোথায় স্পঞ্জ হয় জানো? প্রধানতঃ লোহিত সমুদ্র, ভারত মহাসাগর ও মেক্সিকো উপসাগরে; এই কয়টি জায়গা ছাড়া সমুদ্রের আরো অনেকাংশে।

প্রবাল এবং প্রবাল দ্বীপ

তোমরা অনেকেই প্রবাল দেখেছ। চল্‌তি কথায় প্রবালকে বলে, পলা। লোকে গ্রহশান্তির জন্যে পলা ধারণ করে, অনেক অসভ্য জাতি অলংকারের মত বিশেষ করে রক্ত প্রবালের মালা গলায় পরে থাকে।

প্রবালও স্পঞ্জের মত এক রকম কীট। এক একটি প্রবাল-কীট আকারে খুবই ছোট হয়। তখন তাকে দেখলে, ধারণা করা যায় না যে এই সামান্য একটু প্রাণীই সমুদ্র-গর্ভে এক একটি সুবিশাল ও সুন্দর দ্বীপ গড়ে তুলেছে। কিন্তু একের পক্ষে যা বোঝা, দশের পক্ষে তা খুবই সহজ। প্রবাল দ্বীপ একটি কীটের দ্বারা গঠিত নয়, কোটি কোটি প্রবাল কীট মিলে, এক একটি দ্বীপ গঠন করে। সে দ্বীপের জায়গায় জায়গায় রঙের এমন বাহার যে একবার দেখলে সেখান থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, পরীর দেশে এসে পড়েছি।

এশিয়ার একখানা ম্যাপ নিয়ে দেখ, প্রশান্ত মহাসাগরের এক জায়গায় কতকগুলো দ্বীপের ওপর লেখা আছে—'পলিনেশিয়া।' পলিনেশিয়া মানে "বহু দ্বীপের সমষ্টি।" দ্বীপগুলো এমন ভাবে সাজানো যে দেখলে মনে হয় যেন একটা বেল্‌ট্ (কোমর বন্ধনী)। এই বেল্‌ট্‌টির দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার মাইল, প্রস্থ পনেরো শত মাইল। দ্বীপগুলো কিসের তৈরী জান? প্রবালকীটের।

প্রবাল দ্বীপ ও তার চতুর্দ্দিকে প্রবাল প্রাচীর

সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গাঘাতে ও স্রোতে কত পাহাড় ক্ষয় হয়ে যায়—তার ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই প্রবাল পাহাড় বা দ্বীপ যে চিরকাল একই অবস্থায় থাকে, তা মনে কোরো না। কত প্রবাল দ্বীপ ও পাহাড অবিরত তরঙ্গাঘাতে ক্ষয়ে ভেঙ্গে, চূরমার হয়ে যায়। তাই বলে জায়গাটা একেবারে দ্বীপশূন্য হয়ে পড়ে না, সঙ্গে সঙ্গেই কোটি কোটি কীট আবার দ্বীপ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ কাজটি একদিনে, এক বা এক শ বছরের ফল নয়, এটি সম্পূর্ণ করতে লাগে হাজার হাজার বছর।

এই ভাবে ছোট, অতি দুর্ব্বল প্রবাল কীটগুলি দলবদ্ধ হ'য়ে মহাসমুদ্রের প্রবল স্রোত ও বিপুল তরঙ্গকে পরাজিত করে। একতার কি শক্তি!

প্রবালদ্বীপের এবং প্রবাল প্রাচীর বেস্টনীর মধ্যে যে জল ভাগ থাকে তা' খুব স্বচ্ছ। কেবল তাই নয় ঝড়-ঝাপটার সময়েও এর মধ্যে জাহাজ বেশ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে।

এই হ্রদের অনেকগুলি মুখ থাকে। তার যে কোন একটির ভেতর দিয়ে জাহাজ ভেতরে ঢুকতে পারে।

প্রবালেরা এই সকল মুখ খোলা রেখেছে কেন জান?

বাহির সমুদ্রের তাজা জল ভেতরে প্রবেশ করবার জন্য। নাহলে ভেতরের জলের লবণাংশ নষ্ট হয়ে হ্রদটি প্রবাল কীটের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়বে। সমুদ্রের তাজা

প্রঃ পর

লবণাক্ত জলই প্রবালকীটের প্রাণ-শক্তি ও দেহ গঠনের উপাদান যোগায়। এরা নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই হ্রদের মুখ খোলা রাখে।

প্রত্যেক প্রবাল দ্বীপই যে এক রকম হয় তা নয়। নানা রকমের প্রবাল দ্বীপ আছে।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিতে যে প্রবালদ্বীপ দেখছো, তা গোলাকার বেষ্টনীর মত। এর মধ্যভাগে একটি স্বচ্ছ হ্রদ; চারপাশে প্রবালের দ্বীপ। এই দ্বীপেরও চারিদিক প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল, এই সকল প্রবাল দ্বীপ গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে জেগে উঠেছে। কিন্তু তা' ভুল।

প্রবাল কীট সমুদ্রের গভীর তলে, বিশেষ করে তলদেশের ঠাণ্ডাজলে বাস করতে পারে না। কাজেই এই সব দ্বীপের ভিত্তি একেবারে গভীর সমুদ্রের তলদেশে হতে পারে না।

সমুদ্রের গর্ভে অনেক পাহাড় আছে! এই সকল পাহাড়ের ওপরে প্রবালেরা দ্বীপ রচনা করতে আরম্ভ করে। দ্বীপ নির্ম্মাণ কাজটি বড় মজার। একটির গায়ে একটি, তার গায়ে আর একটি এমনি কোরে কোটি কোটি প্রবাল একত্রে মিলে একটি দ্বীপ গঠন করে।

কত কাল ধরে প্রবাল কীটেরা যে দ্বীপ রচনা করে, তার হিসাব করা কঠিন। তাদের কাজ অবিরত চলে। শেষে

একদিন দেখতে পাওয়া যায়, জল ঠেলে প্রবাল দ্বীপ উঠেছে। কিন্তু তখনই তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। কেননা সমুদ্রের বাইরে এরা বাস করতে পারে না।

এই ছবিটাতে তোমরা দেখছো ঠিক হাত-পাখার মত একটা জিনিষ। জিনিষটা প্রবাল নির্ম্মিত। এর গোড়া সমুদ্র মধ্যস্থিত একটি পাহাড়ের উপর দৃঢ় ভাবে বদ্ধ। এর চার পাশে প্রবাল কীট রয়েছে। এদের ছোট্ট মাথা থেকে কত রকম আলো বেরোচ্চে। ইংরাজীতে একে বলে Sea fan.

প্রথমে এই দ্বীপ এবড়ো-খেবড়ো প্রবালের দ্বারা পূর্ণ থাকে। তারপর সমুদ্রের জলস্রোতে লতা-পাতা, গাছের বীজ, শামুকের খোলা প্রভৃতি দ্বীপের উপর এসে জড় হয়। কালক্রমে এর ওপর ঘাস জন্মে, ঝোপ-ঝাপ দেখা দেয়, সমুদ্রপার থেকে পাখী উড়ে আসে, অবশেষে একদিন মানুষ এসে দ্বীপটিতে নিজের অধিকার বিস্তার করে।

সমুদ্রের এর চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? লোকে ভাবে মানুষ পিরামিড, চীনের প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে ভারী বাহাদুরীর কাজ করেছে! কিন্তু এই সকল ছোট ছোট প্রবাল-কীটাণু—যাদের হয়তো খালি চোখে দেখতেই পাওয়া যায় না, তারা কি অসাধ্য সাধনই না করছে! মানুষ শক্তিমান্ হয়েও এদের মিলিত শক্তির কাছে কত ক্ষুদ্র!

প্রবালের আর একটি আশ্চর্য্য শক্তি হচ্ছে, অপেয় নীল লবণাম্বু রাশির মধ্যে স্বচ্ছ পানীয় জল (sweet water) ধরে রাখা। অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এরা দ্বীপ-গর্ভে পানীয় জল সঞ্চয় করে রাখে।

শামুক জাতীয় সামুদ্রিক কীট
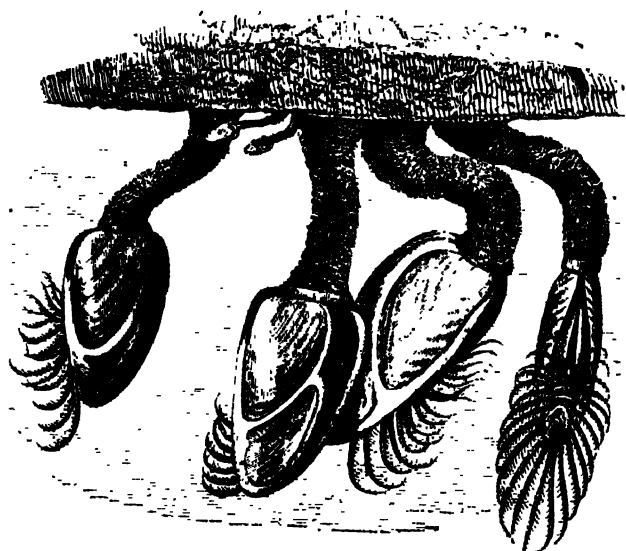
ছবিতে যে অদ্ভূত জিনিষগুলি দেখা যাচ্ছে ওগুলো পদ্মকলি নয়, কতকগুলো প্রাণী। প্রকৃতি তার খেয়াল অনুসারে কত রকম অদ্ভুত প্রাণী যে সৃষ্টি করেছে, তা আমরা কল্পনায়ও আনতে পারি না।

এরা শামুক জাতীয় সমুদ্রিক প্রাণী।

এই প্রাণীর গোড়া কোন জিনিষে এমন দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ থাকে যে তাতে মনে হয় ওরা যেন সেই বস্তু থেকেই উৎপন্ন

হয়েছে। প্রাণীগুলোকে প্রায়ই জাহাজের বা নৌকার তলদেশে দেখা যায়। ছবিতে দেখ নলের মত জিনিষটার আগায় ফুলের বা ফলের মত একটা জিনিষ। ওটিই হচ্ছে আসল প্রাণীর দেহ। প্রাণীটির চারদিকে খোলার আবরণ আছে। খোলার আবরণের মধ্য ভাগে যে দোরের মত ফাঁকটি রয়েছে তার মধ্য থেকে অনেকগুলো সরু সরু হাত বেরিয়ে রয়েছে। ওই হাতগুলি প্রাণীটি ইচ্ছামত ভেতরে গুটিয়ে রাখতেও পারে আবার বাইরে বার কোরে দিতেও পারে।

এই প্রাণী কখনো কখনো কচ্ছপের খোলায় বা তিমি-মাছের চামড়ায় দৃঢ় ভাবে লেগে থাকে।

প্যারিস্ মিউজিয়ামে তিমি মাছের ঠোঁটের একখানি চামড়া আছে, তাতে ৪৫টি এই প্রাণী লেগে আছে।

কিন্তু প্রাণীটি যে সমুদ্রের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তা নয়। কোন কোন অংশে এগুলো প্রচুর। ডুবুরীরা জলে ডুব দিয়ে জলমগ্ন পাহাড়ের গা থেকে অন্য জিনিষের সঙ্গে এই জীবও দুটো চারটে তুলে আনে।

সমুদ্রের পোকা-মাকড়

সমুদ্রে যে সব পোকা-মাকড় বাস করে, তাদের প্রায় সকলকে এ্যানেলাইড্ শ্রেণীতে ফেলা হয়।
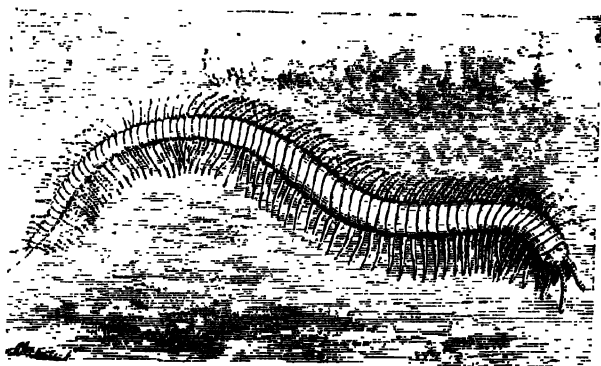
এ্যানেলাইড্

ছবিতে তোমরা যে কীটটি দেখছ, তা' এ্যানেলাইড্ শ্রেণীর অন্তর্গত। পোকাটি দেখ্‌তে 'তেঁতুলে' বিছের মত। এই শ্রেণীর পোকা অনেক রকম আছে ;—কোন কোনটা দুফিটও লম্বা হয়ে থাকে। ঐ পোকারা কিন্তু তিন ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না।

এই পোকাগুলোর শরীর সাতটি রঙএ চিত্রিত এবং সর্ব্বদা জ্বলজ্বল করে। এদের দেহের দুই দিকে চুলের মত কাঁটা জন্মায়। এই সকল কাঁটা দিয়ে এরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

আর, ঐ যে জট পাকানো সাপের মত প্রাণীটি ছবিতে দেখছ, এটি লম্বায় ৪০ফিট ! এটিও এ্যানেলাইড্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

সমুদ্র গর্ভে পাহাড়ের গর্ত্তে বা ছড়ানো পাথরের তলায় এরা বাস করে। এদের খাদ্য সমুদ্রের ছোট ছোট পোকা। এরা লম্বা ফিতের মত শরীরটিকে অনবরত জট পাকায় আর
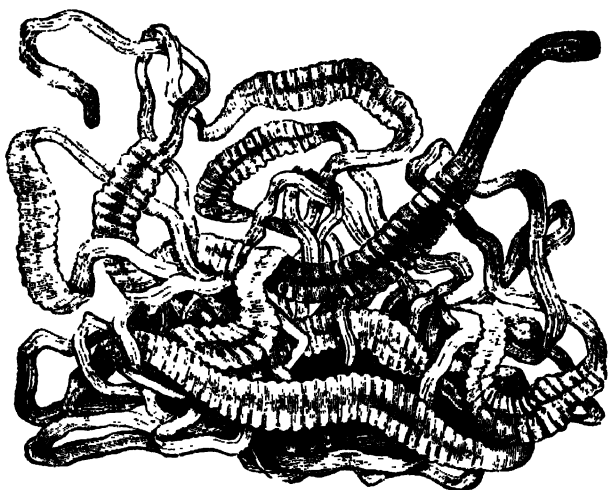
জট পাকানো এ্যানেলাইড্

খোলে। এদের শত্রু মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি সমুদ্রের জীব। এরা তাদের ভয়ে সর্ব্বদা লুকিয়ে বেড়ায়। পোকাটিকে দেখলে মনে হয়, জলজ লতা। শরীরটা জট পাকিয়ে রাখলে এদের শত্রুদের চোখে সহজেই ধূলো দেওয়া যায় বলে প্রকৃতি আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ এই কৌশলটি এদের শিখিয়ে দিয়েছে।

ঘর-বাসী সামুদ্রিক কীট

সমুদ্রের মধ্যে যে কত রকম অদ্ভুত প্রাণী আছে, তার আর সংখ্যা নেই। এদের জীবনযাত্রা এমন বিচিত্র এবং আত্মরক্ষার উপায় এত কৌশলপূর্ণ যে দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

ওপরের ছবিখানি দেখ। বলত ঐ নলগুলো কি? ওগুলো পোকার ঘর: আর, ওদের মুখে শিরীষফুলের মত যে জিনিষ বেরিয়ে আছে তা ফুল নয় পোকা ও তাদের শুঁয়া।

এই পোকাগুলো আপনাদের দেহের চারদিকে ঐ নলের মত আবরণ রচনা করে। হয়তো এরা সারা জীবন ধরে এই ঘর তৈরী করে যায়। এরা সারা শরীরটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে কেবল চুলের মত অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট মাথাটি বার করে রাখে। এই সকল বাহু দিয়েই এরা শিকার ধরে। এদের ফুলের মত মাথাটি লাল, নীল, বেগুনে প্রভৃতি নানা রংএর হয় এবং ফুলের মতই বাড়ে।

সমুদ্রের জলে খুব ছোট ছোট একরকম পোকা আছে। সেগুলো এদের খাদ্য। এই পোকাগুলো এদিকে-ওদিকে ভেসে বেড়ায়। ওরা যখন ওদের শুঁয়া বা হাতগুলো নাড়ে, তখন জলে স্রোতের সৃষ্টি হয়। সেই স্রোতের টানে ঐ ক্ষুদে পোকাগুলো ওদের মুখের কাছে ভেসে আসে। তারপর যা হয়, সহজেই বুঝতে পারছ।

ঐ ঘরবাসী পোকাগুলো কেবল যে ঘরে ঢুকেই ক্ষান্ত হয় তা নয়, একখানি হাত দিয়ে আবার দরজাটি বন্ধ করে রাখে!

কখনো কখনো এরা অনেকে একটি ঘরে একত্রে বাস করে।

মেডুসি

ছবিতে ব্যাঙের ছাতার মত যা' দেখছো তা' ব্যাঙের ছাতা নয়, একটা প্রাণী।

প্রাণীটার নাম মেডুসি। এদের দেখতে ভারী সুন্দর। এরা

নানা রঙএর এবং নানা আকৃতির হয়। মেডুসিরা অন্ধকারে সমুদ্র গর্ভে জ্বলজ্বল করে। অনেকগুলি মেডুসি এক সঙ্গে থাক্‌লে সমুদ্রের জল ঝক ঝক করে। মনে হয় কে যেন জলে আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

এদের জল থেকে তুলে এনে ডাঙ্গায় রাখলে তিমি মাছের চর্ব্বির মত থলথলে দেখায়। এদের শরীর এমন কোমল যে রৌদ্রের তাপে চর্ব্বির মত গলে যায়। এই রকম একটা অদ্ভুত জন্তুর মধ্যে যে প্রাণ আছে তা বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখ্‌লে, এরা যে জীবিত তা বোঝা যায়। যখন গলতে গলতে দেহ থেকে প্রায় সবই বেরিয়ে যায়, তখন যা পড়ে থাকে তা ভারী অদ্ভুত জিনিষ।

সেই জিনিষটি হচ্ছে একটি স্বচ্ছ মাকড়সার জালের মত বহু কোষবিশিষ্ট কঙ্কাল।

লক্ষ্য করে দেখ, এই মেডুসির মূলে ব্যাঙের ছাতার মত যে জিনিষটি রয়েছে তার চার পাশ থেকে যেন ঝালর ঝুল্‌ছে। এর দরুণ প্রাণীটা দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতি এগুলো তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে দেয়নি। এই ঝালরগুলো তার বাহু। এই ছাতার মধ্যেই আছে মেডুসির পাকস্থলী আর এই পাকস্থলীর মুখেই তার মুখ।

মুখটি সব সময় 'হাঁ' হয়েই আছে। মেডুসিরা বাহুর দ্বারা শিকার ধরে মুখের মধ্যে ফেলে দেয়।

সমুদ্রে অনেক জাতের মেডুসি আছে। ছবিতে ঘণ্টার মত যে মেডুসিটিকে দেখতে পাচ্ছ এরা জলের চেয়েও ভারী।

ঘণ্টার মত মেডুসি

এদের ছাতার মত অংশ দ্বারা এরা সাঁতার কাটে। তা নাহলে এরা সমুদ্রে তলিয়ে যেত। এদের ছাতাটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। এজন্য এরা শান্ত সমুদ্রে বেশ ঘুরে বেড়াতে পারে।

স্থলচর মাছ

এই সকল মাছের চলা-ফেরা সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এরা কিভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় সে বিষয় কিছু বলবো।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনধারণের জন্য বাতাস দরকার। বাতাসের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী জিনিষ হচ্ছে অক্‌সিজেন। অক্সিজেন না হলে, কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে সর্ব্বদা বাতাস থেকে ফুস্‌ফুসে অক্‌সিজেন টেনে নিচ্ছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ নাসিকা।

জলেও মাছেরা সর্ব্বদা জল থেকে অক্‌সিজেন টেনে নিচ্ছে।

কিন্তু মাছের শ্বাসযন্ত্র (ফুস্‌ফুস্) ও শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ আমাদের মত নয়। তার যে রকম শ্বাসযন্ত্র দরকার, প্রকৃতি তাকে সেই রকমই দিয়েছেন। তোমরা মাছের ঝিল্লি দেখেছ। মাছের 'কান্‌কোর' নীচে লাল রঙের ঝিল্লি থাকে। লোকে ঝিল্লির লাল রং দেখে মাছ তাজা কিনা তাই বিচার করে।

এই ঝিল্লিই মাছের ফুস্‌ফুস্। মাছ যখন নিশ্বাস নেয়, তখন সে হাঁ করে খানিকটা জল টেনে নেয়। সেই জল মুখের ভেতর দিয়ে তার ঝিল্লিতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। কারণ কান্‌কোর ঢাক্‌নিতে

আটকে যায়। এই সকল ঝিল্লিস্তরের মধ্যে রক্তবাহী শিরা আছে। ঝিল্লিগুলি জল থেকে অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করে এবং কারবন ডাইঅক্সাইড নামে বিষাক্ত বাষ্প ছেড়ে দেয়। এই সকল ব্যাপার এক মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মাছ আবার জল বা'র করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ আবার জল নেয়। জল কানকো দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ঝিল্লির গায়ের কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে ধুইয়ে ফেলে।

কিন্তু ডাঙ্গায় এলেই মাছের ঝিল্লি শুকিয়ে যায়। তখন মাছ আর নিঃশ্বাস নিতে পারে না। এইজন্য মাছকে ডাঙ্গায় তুললেই মরে যায়।

কিন্তু কতকগুলি মাছ আছে যাদের ঝিল্লি শুকোয় না। তাদের ঝিল্লির মধ্যে কোষ থাকে এবং তা সর্ব্বদা জলে পূর্ণ। এইজন্যে এই সকল মাছ দু'চারদিন ডাঙ্গায়ও বাস করতে পারে। এই শ্রেণীর মাছের কথাই এবার বলবো।

এই সকল মাছের মধ্যে অনেকে ডাঙ্গায় চলতে তো পারেই —অনেকে আবার পোকামাকড় ভালবাসে বলে পোকামাকড়ের জন্যে গাছেও উঠে।

সমুদ্রে যে কত রকম মাছ আছে এবং তারা যে কি অদ্ভুত, না দেখলে তা বুঝতে পারা যায় না!

পর পৃষ্ঠার ছবির মাছটি কি ভয়ঙ্কর দেখতে—যেন একটা

রাক্ষস। এর ভীষণ মুখটি দেখ্‌লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। এই সকল মাছের ঝিল্লি এমন ভাবে তৈরী যে এরা অনেকক্ষণ ডাঙ্গায় বাস করতে পারে।
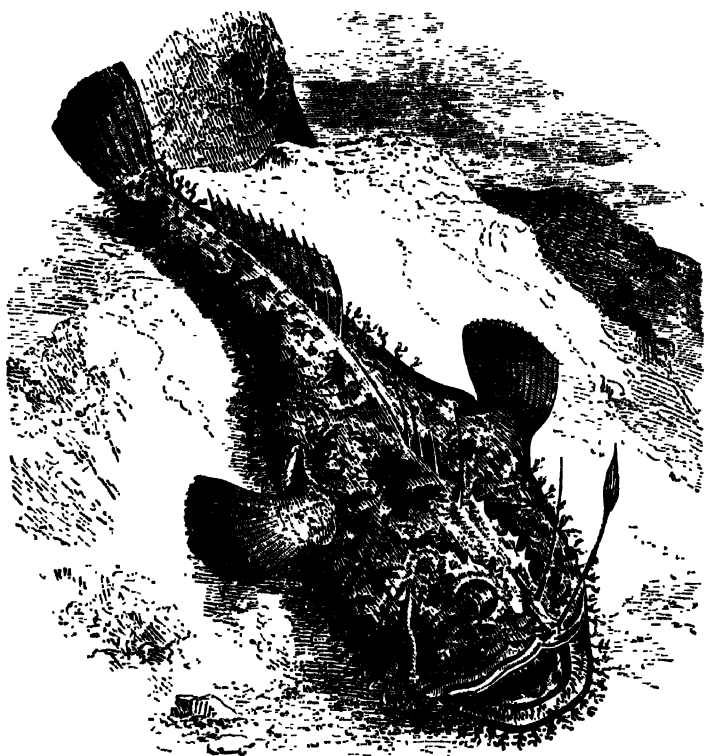
গ্রীসদেশের পণ্ডিত এ্যারিসটট্‌ল একে ব্যাঙ্‌ জাতীয় প্রাণী বলেচেন। আমরা যেমন ছিপ দিয়ে মাছ ধরি, এরাও তেমনি

ছিপ দিয়ে মাছ ধরে খায়। এদের ছিপ ও ছিপ দিয়ে মাছ ধরার রীতি কিন্তু আমাদের ছিপ দিয়ে মাছ ধরার রীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রকৃতি এদের শরীরে টোপ-শুদ্ধ একটা অদ্ভুত ছিপ জুড়ে দিয়েছে। তার দ্বারা এরা শিকার ধরে।

এদের মাথার সামনে লম্বা শিঙের মত একটা জিনিষ রয়েছে এ তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। এর সাহায্যেই এরা মাছ ধরে। ছিপধারী মাছেরা ভাল সাঁতার দিতে পারে না। সেজন্য ছোট ছোট মাছেরা এদের সমুখ দিয়ে নিরাপদে সাঁতরে পালিয়ে যায়।

একারণে এরা একটি কৌশল অবলম্বন করে। মাছগুলো কাদার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে চারদিকের কাদা ঘুলিয়ে তার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে থাকে। তারপর শিঙের মত যন্ত্রটা খাড়া করে রাখে এবং কখনো কখনো এটাকে নাড়ায়। এই জিনিষটি খুব উজ্জ্বল। চারিদিক থেকে এটাকে দেখতে পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি একটি মাছ, কোন পোকা-মাকড় নড়চে ভেবে তার কাছে এসে পড়ে এবং জিনিষটাকে ঠোকরাতে আরম্ভ করে। তখন সে বেচারীর ভাগ্যে কি ঘটে জানো? মুহূর্ত্ত মধ্যে টোপটি অন্তর্হিত হয়, আর তার জায়গায় ভেসে ওঠে একটি প্রকাণ্ড হাঁ। তারপরই সে

সরাসরি মাছটির একেবারে পেটের মধ্যে চলে যায়। আবার তৎক্ষণাৎ সেখানে দেখা দেয় সেই আগের টোপ। এমনি করে বহুক্ষণ শিকার ধরা চলে।

এই মাছগুলো বেজায় পেটুক ও লোভী।

মাছগুলোর শরীরের চারদিকে অসংখ্য পায়ের মত অঙ্গ আছে; সেগুলোর সাহায্যে এরা ডাঙ্গায় চলাফেরা করতে পারে।

নেকড়ে বাঘ মাছ

পুকুরের শান্ত জলে যখন তোমরা দেখ মাছগুলি কেমন সুন্দর ভাবে এঁকেবেঁকে সাঁতার কাটছে, কখন গভীর জলে ডুব মারচে, কখন চিক্‌চিক্ করতে করতে ওপরে উঠ্‌চে, কখন দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন হয় তো মনে করো মাছের জীবন কি সুন্দর!

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। মাছকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে অনবরত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। মাছেরা নির্দ্দয় ভাবে একে অপরকে আক্রমণ করে। সমস্ত সমুদ্র-জগৎ যেন একটি বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র—সেখানে অনবরত সবল দুর্ব্বলকে আক্রমণ করছে।

এক রকম মাছ আছে, তাকে সমুদ্রের নেকড়ে বাঘ বলা হয়। এরা ভারী সাংঘাতিক জন্তু। দাঁতের প্রত্যেক চোয়ালে ছ' সার দাঁত আছে এবং তাতে ধার ও এত জোর যে এরা খোলা শুদ্ধ সমুদ্রের গলদা চিংড়ি বা বড় বড় কাঁকড়া ভেঙে-গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেলে।

কেবল দাঁতের ধার থাকলে বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না, মাছগুলোর মেজাজও বড় খারাপ। হাত দিয়ে যদি কেউ এদের ধরে, তাহলে তার রক্ষা নেই! কামড়ে তার হাতখানা রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তাই জেলেরা এদের

বড় ভয় করে। সেইজন্য তারা এদের ধরবামাত্রই মাথায় ডাণ্ডার ঘা দিয়ে, মেরে ফেলে। অনেক সময় দেখা গেছে সমুদ্রের এই নেকড়ে বাঘেরা জাহাজের লোহার নোঙর কামড়ে তাতে দাঁতের দাগ বসিয়ে দিয়েছে।

এক সময় একজন নাবিক একটা নেকড়ের মুখের সঙ্গে বন্দুকের চোঙ্ লাগিয়ে মজা দেখ্‌ছিলেন। নেকড়েটি তৎক্ষণাৎ চোঙ্‌টি দাঁতে চেপে চুরমার করে দিয়েছিল।

এই মাছগুলি খুব বড় বড় হয়। এদের প্রায় লম্বায় ৬।৭ ফিট অবধি হতে দেখা গেছে। শীত প্রধান দেশেই এদের দেখতে পাওয়া যায়।

ডাঙ্গায় যেমন আমরা নেকড়ে বাঘকে ভয় করে চলি, জলে সেই রকম এদেরও ভয় করে চলতে হয়।

নেকড়ে-মাছের কবলে পড়ে অনেক সময় অনেকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

অন্য মাছেরা এদের যমের মত ভয় করে। যদি জান্‌তে পারে, কাছে নেকড়ে-মাছ আছে, তাহলে তারা সাবধান হয়ে সরে পড়ে। মাছগুলোর ক্ষুধাও রাক্ষসের মত। সারাক্ষণ কেবল "খাই খাই" করে চারধারে ঘুরে বেড়ায়;—ত্রিশ চল্লিশটা মাছ খেয়েও ক্ষুধা মেটে না। এমন রাক্ষসের ত্রি-সীমানায় কে সাধ করে ঘেঁষবে?

তরোয়াল মাছ

আর এক রকম মাছ আছে তাদের মুখের সঙ্গে প্রকৃতি একখানি ভীষণ ধারালো তরোয়াল জুড়ে দিয়েছে। এইজন্যে লোকে একে তরোয়াল মাছ বলে।

এই তরোয়ালটি সাংঘাতিক অস্ত্র। ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটি কত লম্বা?

জিনিষটা কিন্তু এই মাছের ওপরের চোয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। এর নীচে ছোট ছোট ধারালো দাঁতের সারি আছে।

মাছগুলোর গায়ে যেমন জোর, স্বভাবও তেমনই রুক্ষ। অনেক সময় বিনা কারণেই আক্রমণ করে। মাছগুলো এক একটা আকারে আট দশ হাত লম্বা হয়। এরা সাঁতারও দিতে পারে খুব তাড়াতাড়ি।

তরোয়াল মাছ তিমি মাছের ভয়ঙ্কর শত্রু। অতি সহজেই এরা তিমির শরীরে তরোয়াল বসিয়ে দেয়। তিমি অত বড় জন্তু; কিন্তু একটা তরোয়াল মাছ বার কয়েক তার তরোয়াল বিদ্ধ করেই তাকে মেরে ফেলে।

তিমির বৃহৎ লেজ ভিন্ন তার আর কোন অস্ত্র নেই। সে যদি লেজ দিয়ে তরোয়াল মাছকে আঘাত করতে পারে, তা'হলে সেই আঘাতেই তরোয়াল মাছ কাৎ। কিন্তু তরোয়াল মাছও

তরোয়াল মাছ তিমি মাছকে আক্রমণ করেছে।

ভারী সেয়ানা; কখনো এদের লেজের কাছে ঘেঁসে না। এক এক সময় তিমির সঙ্গে তরোয়াল মাছের এমন সাংঘাতিক যুদ্ধ হয় যে, বহুদূর থেকেও তার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

কখনো কখনো তরোয়াল মাছ জাহাজের তলদেশে তরোয়াল ফুটিয়ে দেয়। কিন্তু এমন মজা যে, এরা আর তরোয়াল বার করতে পারে না, সেখানেই তরোয়াল আটকে যায়।

একজন বৈজ্ঞানিক এক সময় দেখেছিলেন, একটি তরোয়াল মাছ জাহাজের তলদেশ থেকে তরোয়াল বা'র করবার চেষ্টা করছে। মাছটি প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষকালে সে তরোয়ালটি রেখে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হোল।

অবশ্য এও দেখতে পাওয়া গেল যে, অতি শীঘ্রই মাছটি ঢেউএর ওপর উল্টে পড়ে মরে গেল।

এদের তরোয়াল এত শক্ত যে তার এক আঘাতেই প্রায় তেরো ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তা স্বচ্ছন্দে ছেঁদা করে ফেলতে পারে।

উড়ো মাছ

ছবিতে যে সকল মাছ দেখছ, ওদের বলে উড়ো মাছ মাছগুলো জলেও সাঁতার দেয়, শূন্যেও উড়ে।
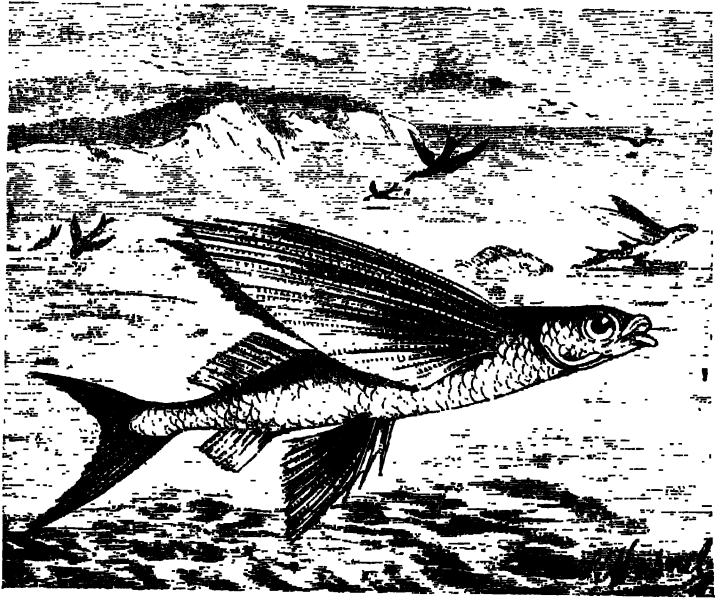
এদের ওড়া দেখ্‌তে বড় মজার। জাহাজ চলেছে; শান্ত সমুদ্র। হঠাৎ দেখা গেল তার মধ্য থেকে কয়েকটা মাছ শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে উড়তে আরম্ভ করলে।

ছবিতে দেখ এদের ডানা দুখানা কত বড়। দেখতে কতকটা পাখীর ডানার মত। এই ডানার জন্যে কিন্তু এদের সাঁতারের কোন বাধা হয় না। সাঁতার দেবার সময় ডানা দুটি দু'পাশে মোড়া থাকে।

মাছগুলো একসঙ্গে ৫০।৬০ গজ কখনও কখনও তারও বেশী উড়তে পারে। তারপর আবার জলে নেমে ঝিল্লি দুটি জলে ভিজিয়ে নেয়। তা নইলে অকসিজেনের অভাবে মারা যাবে।

কিন্তু এদের ওড়া ব্যাপারটা পাখী বা বাদুড়ের ওড়ার মত নয়। ওদের মত এরা ডানা নাড়তে পারে না। এদের ডানা দুখানা বাতাসে প্যারাচুটের কাজ করে। এর সাহায্যে এরা বাতাসে ভেসে থাকে মাত্র। যখন এরা সমুদ্র থেকে লাফ মারে তখন কেবল ডানাই মেলে না, লেজও প্রসারিত করে।

এদের ওড়ার আর একটু বিশেষত্ব এই যে, এরা ওড়বার সময় ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে না, সোজা চলে। কেননা শূন্যে এদের লেজ বিশেষ কোন কাজে আসে না।

শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বা জাহাজের ভয়ে জল থেকে পালাবার সময় এরা লাফ মারে। সে সময়ই ওড়ে।

কিন্তু দিনের বেলায় এরা জল থেকে বেশী ওপরে উঠতে পারে না ; রাত্রে বাতাসের সাহায্যে জল থেকে প্রায় বিশ ফিট ওপরে ওঠে।

ডল্‌ফিনেরা উড়ো মাছদের আক্রমণ করছে।

এদের রূপালি ডানা আর নীল দেহ সূর্য্যের আলোয় যখন ঝক ঝক করে তখন ভারী সুন্দর দেখায়।

কিন্তু এদের এমন কপাল যে উড়েও শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সমুদ্রের গল্ পাখী ও ভীষণ আলবাতরাজ পাখীরাও শিকারের জন্যে সমুদ্রের ওপর উড়ে বেড়ায়। যেই এই সব মাছ উড়তে আরম্ভ করে ওরাও অমনি এদের আক্রমণ করে।

ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ডল্‌ফিনেরা (তিমি জাতীয় ক্ষুদ্রকায় জীব) এই সকল উড়ো মাছদের তাড়া করেছে। এই সব উড়ো মাছ আত্মরক্ষার জন্য বৃথাই শূন্যে লাফ্ মারছে। এইরকম ভাবে জলে ও শূন্যে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বেচারীরা প্রাণ হারায়।

মাছগুলো ভারী বোকা। জাহাজের নাবিকেরা মাঝে মাঝে উড়োমাছ ধরবার জন্যে রাত্রে বড় বড় আলো জ্বালে। এই আলো দেখে বোকা মাছগুলো জাহাজের খোলে উড়ে এসে পড়ে এবং নাবিকেরা তৎক্ষণাৎ তাদের ধরে ফেলে। মাছগুলো খেতে ভারী মিষ্টি!

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের সমুদ্রে প্রায়ই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োমাছ দেখতে পাওয়া যায়।

ভূমধ্যসাগরেও একরকম মাছ আছে তাদের নাম উড়ুক্কু গারনার্ড। এরাও উড়তে পারে; কিন্তু আগে যাদের কথা বললাম, তাদের মত নয়। আগের মাছগুলো "হেরিঙ" শ্রেণীর অন্তর্গত।

হেরিঙ ও সলমন মাছ

মহাসমুদ্রের গর্ভে মানুষের প্রচুর খাদ্যও পাওয়া যায়।

কখনো কখনো মাইলের পর মাইল ধরে হাজার হাজার মাছের এক একটা ঝাঁক সমুদ্র গর্ভ থেকে নদী গর্ভে উঠে আসে।

এদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, তা' কল্পনায় আনা যায় না। মাছগুলো ক্রমাগত নদী গর্ভে উঠে আসতে থাকে।

সেই সময় শিকারের আশায় তাদের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীও উড়তে থাকে। হাঙ্গরেরাও প্রাণ ভরে এই মাছ খায়। অনেক বড় বড় পেটুক মাছও হাঙ্গরের পথ অনুসরণ করে।

তাই বলে সব মাছই যে এমন ভাবে নদীতে উঠে আসে তা নয়, কয়েক শ্রেণীর মাছই এই ভাবে এসে থাকে। তাদের এক শ্রেণীর নাম হেরিঙ। হেরিঙ অনেক রকমের আছে।

হেরিঙ মাছ সাধারণতঃ গভীর জলে থাকে না, জলের ওপর দিকে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

জেলেরা যখন বুঝতে পারে হেরিঙের ঝাঁক মাছ আসছে, তখন তারা ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চারদিকের নৌকা থেকে জেলেদের জাল পড়তে আরম্ভ করে।

রাত্রি সুরু হলেই মাছ ধরা আরম্ভ হয়। কারণ রাত্রি না হলে হেরিঙ মাছ জালে পড়ে না।

এক রাত্রে কত হেরিঙ মাছ যে জালে পড়ে, তা' তোমরা

হেরিঙ মাছ শিকার

শুনলেও বিশ্বাস করবে না! মাছের ভারে নৌকোডুবি হবার ভয়ে অনেক সময় জাল কেটে দিতে হয়।

হেরিঙ মাছ ডিম পাড়তে তীরের কাছে বা নদীতে আসে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে এরা আবার গভীর সমুদ্রে ফিরে যায়।
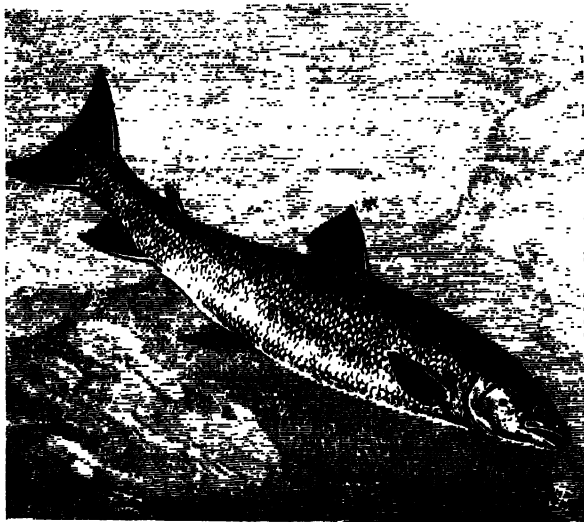
সলমন মাছ

হেরিঙ মাছরা যেখানে বাস করে সেখানে একরকম ছোট ছোট মাছ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সব মাছ খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। তবে খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে হেরিঙ মাছদের বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান নেই। বড় বড় হেরিঙ বাচ্চা হেরিঙ মাছ পেলেও মনের আনন্দে খেতে থাকে।

মাছগুলো বেজায় খামখেয়ালী। যেখানে তারা বছর বছর ধরে আসতো হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেখানে তারা আসে নি। ভবিষ্যতে আবার কখনো যে আস্‌বে, তারও সম্ভাবনা নেই; হয়ত আর আস্‌বেই না।

তবে আয়র্ল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে—এ সব অঞ্চলে এদের প্রায়ই দেখা যায়।

সলমন মাছের প্রকৃতি অনেকটা হেরিঙ মাছের মত। এরাও দল বেঁধে সমুদ্র থেকে নদী গর্ভে উঠে আসে। এরাও নদী গর্ভে ডিম পাড়ে। এই সব মাছ কেন যে নদীতে ডিম পাড়ে, তার নানা কারণ আছে। এরাও অতি দ্রুতগতিতে নদীর মধ্যে চলে আসে; আর জেলেরাও মনের সাধে এই দামী মাছ ধরতে আরম্ভ করে। যখন এরা হাজারে হাজারে নদীতে আসে, তখন এদের অবশ্য বেশী দাম থাকে না।

এরাও ডিম পাড়বার পর আবার সমুদ্রে চলে যায়।

এরা নদীর ফাটালের মধ্যে ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলিকে সলমন-মাতা বালি চাপা দিয়ে রেখে চলে যায়। পরবর্ত্তী বসন্ত কালে যখন ডিম ফুটে বাচ্চাদের জন্ম হয় তখন তারাও আবার সমুদ্রে চলে যায়।

পিতামাতার সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধই নেই। মায়ের দরদ কেবল ডিমগুলিকে তার বিবেচনামত নিরাপদ জায়গায় পেড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত।

হুল-ওয়ালা মাছ

প্রকৃতি সকল প্রাণীরই আত্মরক্ষার কোন না কোন অস্ত্র দিয়েছে। মাছদেরও আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার অস্ত্র

হুল-ওয়ালা মাছ

আছে। কারো বা মস্ত বড় মুখ, তাতে বড় বড় শক্ত দাঁত; কারো গায়ে ভীষণ জোর, কেউ বা দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে, কেউ বা ভারী চালাক।

একরকম মাছ আছে এদের বলা হয় হুলওয়ালা মাছ। মাছগুলোর শরীর খুব চওড়া। তার চারদিকে সূর্য্যের রশ্মি-জালের মত চামড়া আছে। তা' তারা কখনো মুড়তে পারে না।

মাছগুলোর লেজ লম্বা, তাতে তিন চারটি ছোট ছোট ডানা আছে। এদের সমস্ত শরীরে কাঁটার মত হুল দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি এদের অস্ত্র।

মাছগুলো আক্রান্ত হলে সমস্ত শরীর এমন ভাবে বাঁকায় যে, লেজের প্রান্তটি নাকে এসে ঠেকে। তারপরই হঠাৎ লেজটি শত্রুকে ছুঁড়ে মারে এবং সেই সঙ্গে লেজের ও সারা দেহের কাঁটা বা হুল তার গায়ে বিঁধিয়ে দেয়। এদের হুলগুলি এত তীক্ষ্ণ যে, যার গায়ে লাগে—তার অবস্থা সাংঘাতিক হয়।

একবার আমাদের দেশের একজন লোককে সাঁতার দিয়ে নদী পার হবার সময় এই মাছ লেজ দিয়ে আঘাত করে। তাতে তার এত লেগেছিল যে, যখন সে তীরে এল তখন যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল—যেন সে নিজেকে আর সামলাতে পারছে না।

দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে এই সমস্ত মাছ খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এর হুল আর বিকট চেহারার জন্য এদের বলা হয় সমুদ্রের শয়তান।

কখনো কখনো এরা ১৫ ফিট চওড়া হয়ে থাকে।

টরপেডো মাছ

টরপেডো মাছ অনেকটা হুলওয়ালা মাছের মত দেখতে তবে এর চার দিকে রশ্মিজালের মত যে চামড়া আছে তা' একটু আলাদা রকমের। আর এর আত্মরক্ষার অস্ত্রও বড় অদ্ভুত।
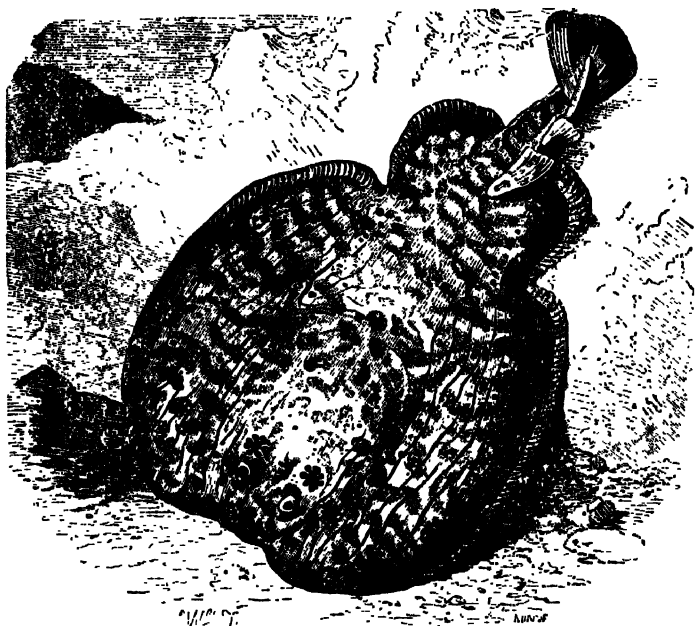
এরা ভূমধ্যসাগরে বাস করে। তোমরা বৈদ্যুতিক ঈল মাছের নাম শুনেছ? অনেক সময় ইলেকট্রিকের তারে

হাত দিলে যেমন ভীষণ শক্ লাগে, ইলেক্‌ট্রিক ঈল মাছের গায়ে হাত দিলেও সেই রকম শক্ লাগে। টরপেডোও সেই রকম শক্ দেয়, তবে কিছু অল্প।

এদের খাদ্য মাছ; কেবল মাছ বললে ঠিক হবে না। কেন না এরা সমুখে যা পায় তাই খায়।

টরপেডোকে দেখতে ভারী বিশ্রী; অনেকটা বেহালার মত। কিন্তু প্রকৃতি এর শরীর এমন ভাবে নির্ম্মাণ করেছে যে, একে ছুঁলেই সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে ওঠে।

এর আগাগোড়া শরীর সরু সরু নলে পরিপূর্ণ! দেখ্‌লে মনে হয় যেন একখানা মৌচাক। এই সকল নলমুখ থেকে একরকম জলীয় পদার্থ বার হয়।

সমুদ্রের বা ডাঙ্গার সব প্রাণীই টরপেডোকে ভারী সমীহ করে চলে। এরা শিকারকে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে জড় বা নিস্তেজ করে খেয়ে ফেলে।

শিকার ধরবার সময় মাছগুলো বালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে; সেই সময়েই এদের ভয় করে চলতে হয়। যদি কোন হতভাগ্য সেই সময় খোঁচাখুচি করে তাহলে রেগে এমন জোরাল শক্ লাগায় যে, সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এখনকার দিনে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে অনেকে বাত সারায়। অনেক কাল আগে লোকে টরপেডো মাছের সাহায্যে সেই কাজ করতো।

ম্যাকরেল মাছ

ম্যাকরেল ভারী সুন্দর মাছ। মাছগুলো ভাজা খেতে চমৎকার লাগে।

কিন্তু মাছগুলো ভারী লোভী। হেরিঙ্ মাছের ঝাঁককে অনুসরণ করে তাদের নিষ্ঠুর ভাবে মেরে খায়।

এরা উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরে বাস করে। এই
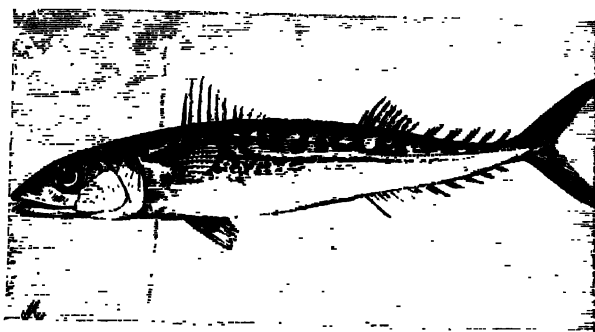
মাছদের আগে আগে এক শ্রেণীর মাছ সর্ব্বদাই সাঁতার কাটতে থাকে। তাদের লোকে বলে, ম্যাকরেলদের পথ-প্রদর্শক। এই সকল মাছদের ঈল মাছের মত গোল দেহ এবং মুখখানি লম্বা, তাতে খুব ধারাল দাঁত আছে।

ম্যাকরেলদের ধরা খুব সহজ, কেননা এরা এত লোভী যে, যে-কোন টোপ অনায়াসেই গিলে ফেলে।

ম্যাক্‌রেলদের গায়ের রঙ বড় সুন্দর। কিন্তু জল থেকে তুললেই শরীরের সুন্দর রঙ মলিন হয়ে যায়। হয়তো কিছুক্ষণ অন্ধকারে আগুনের মত জ্বলতে থাকে, তারপর ক্রমশঃ ম্লান হয়ে নিবে যায়।

অনেক রকম ম্যাকরেল আছে;—যেমন বোনিতো, টুনি, স্ক্যাড্ ইত্যাদি।

বোনিতো মাছ উড়োমাছের ভীষণ শত্রু। জেলেরা এই মাছ ধরবার জন্যে উড়োমাছের টোপ বঁড়শিতে গেঁথে টোপটা এমন ভাবে ধরে যেন মাছটা উড়ছে। টোপ দেখেই বোনিতোমাছ জেলের হাতের গোড়ায় এসে পড়ে।

টুনি মাছ খেতে ভারী মিষ্টি। লোকে টুনি মাছ শিকার করে বড়লোক হয়ে যায়। এক একটা টুনি মাছ ওজনে তিন চার মণও হয়ে থাকে।

একরকম ম্যাকরেল আছে, তাদের বলা হয়, স্ক্যাকড্‌স্ বা হরস্ ম্যাক্‌রেল। এরা বড়া মজার মাছ।

প্রাচীনকালে নাবিকেরা এদের বলতেন, পথ-প্রদর্শক। কোন জাহাজ দেখলেই এরা তার আগে আগে সাঁতার দিয়ে চল্‌ত। তাই দেখে নাবিকেরা বুঝতে পারতেন কাছেই ডাঙ্গা আছে। সেইজন্যে মাছগুলোকে তাঁরা কখনও শিকার করতেন না।

এই মাছগুলো কেবল যে নাবিকদেরই পথ-প্রদর্শক তা

নয়; হাঙরদেরও পথ দেখিয়ে চলে। অনেক সময় এদের ঠিক পিছনেই থাকে, হাঙরের ঝাঁক।

ম্যাক্‌রেল্‌রা খুব দ্রুত সাঁতার দিতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে যেতেও এদের বাধে না।

সাপ মাছ

ছবিতে সাপের মত যে জন্তুটি দেখছ, তা সাপ নয় মাছ
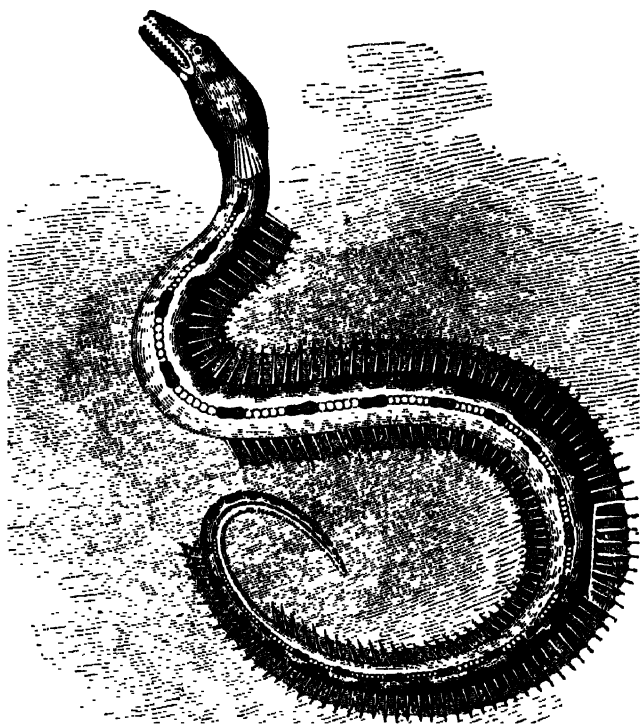
মাছগুলো সাধারণতঃ মানুষের হাতের মত মোটা এবং লম্বায় ৬ ফিট হয়। সাপ মাছ অনেক রকম আছে।

এক রকম ঈল মাছ আছে, তারাও সাপের মত দেখতে। ঈলেরা সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। ঈলেদের মাছের মত ঝিল্লি আছে, তা থেকেই বোঝা যায় এরা সাপ নয়, মাছ।

ভূমধ্যসাগরে একরকম ঈলমাছ আছে রোমকরা তাদের ভারী পছন্দ করতো। তারা পুকুর কেটে অতি যত্ন করে এই সব মাছ ধরে রাখতো এবং ঠিক সোনা রূপোর মতই তাদের সম্পত্তি জ্ঞান করতো। আর এক শ্রেণীর মাছকেও রোমকরা খুব পছন্দ করতো তার নাম, মরে মাছ।

এগুলোকেও সাপের মত দেখতে। এরা যেমন লোভী তেমনি দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র। এদেরও রোমকরা পুকুরে পুষে রাখতো। যদি কোন দাস কোন অপরাধ করতো তাহলে তার প্রভু তা'কে মরে মাছপূর্ণ পুকুরে ফেলে দিতো; আর মরে মাছেরা তাকে পরম আনন্দে খেয়ে ফেলতো।

সম্রাট নেরো বড় দুর্দ্দান্ত ও নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে লোকে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নেরো অনেককে মরে মাছের মুখে ফেলে দিয়ে কৌতুক দেখতেন।

মাছগুলো খুব বড় বড় কাচের চৌবাচ্চায় রেখে দেওয়া হত। কোন লোককে তার মধ্যে ফেলে দিলে, মাছগুলো চারধার থেকে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করত; আর সেই হতভাগ্য এই রাক্ষসগুলোর কবল থেকে রক্ষা পাবার যে রকম চেষ্টা করত, তা নৃশংস প্রকৃতির লোকের পক্ষে উপভোগ্য বটে।

হাঙ্গর

সমুদ্রে সকলের চেয়ে ভীষণ, সকলের চেয়ে হিংস্র এবং সকলের চেয়ে ঘৃণিত জীব হচ্ছে হাঙ্গর।

হাঙ্গর লোণা জলের প্রাণী। সমুদ্রে ও সমুদ্রের কাছে নদীর লোণা জলে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে। হাঙ্গর আমাদের নদীতে বড় একটা আসে না। তবে কোন কোন নদীতে মেছো কুমীরের মত একরকম মেছো হাঙ্গর দেখা যায় বটে, কিন্তু কেউই তাকে ভয় করে না। কেন না এরা বড় নিরীহ।

কিন্তু শ্বেত হাঙ্গর নামে একশ্রেণীর হাঙ্গর আছে, তারা বড় হিংস্র।

যদি কখনো তোমাদের সুযোগ হয় তাহলে দেখো এদের মুখখানি কি বিরাট আর মুখে কত সার দাঁত! দাঁতগুলোতে ক্ষুরের মত ধার। এই দাঁত দিয়ে এরা অতি সহজেই যে কোন শক্ত জিনিষ দুখানা করে কেটে ফেলতে পারে।

শ্বেত হাঙ্গরের দাঁতগুলো ছয়টি সারিতে সাজানো। দাঁতগুলি প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া এবং তিনকোণা। যখন দাঁতের ব্যবহার করে না, তখন দাঁত শুদ্ধ মুখ নীচু দিকে থাকে। কিন্তু যেই কোন মাছ কিংবা কিছু কাছে আসে, তখনই দাঁতগুলি ওপর দিকে ওঠে। এদের দাঁতওয়ালা মাড়ী দেখলে মনে হয় যেন একখানি ধারাল করাত।

শ্বেত হাঙ্গরের কবলে একজন নাবিক।

প্রাণীগুলোর ক্ষুধা রাক্ষসের মত ; কিছুতেই মিট্‌তে চায় না। রাতদিন খাবারের চেষ্টায় দল বেঁধে চারধারে ঘুরে বেড়ায়।

অনেক হাঙ্গরের দল জাহাজের অনুসরণ করে। সে সময় যদি কোন লোক জাহাজ থেকে পড়ে যায় তাহলে তার আর রক্ষা নেই। তাকে হাঙ্গরেরা নিশ্চয়ই ধরে খণ্ড খণ্ড করে কেটে গিলে ফেলবে। কিছুদিন আগে লোহিত সাগরে একজন নাবিক জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যায়, লোকটি খুব ভাল সাঁতার জানত। জলে পড়েই সে সাঁতার দিতে লাগল ; এদিকে তাকে উদ্ধার করার জন্য জাহাজ থেকে বোটও নামান হল। কিন্তু বোটখানা তার কাছে পৌঁছাবার আগেই হাঙ্গরে তাকে কেটে-কুটে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেললে, অবশিষ্ট থাক্‌ল, কেবল লোহিত সাগরের নীলজলে তার তাজা রক্ত।

আজকাল ষ্টীম জাহাজ হয়ে হাঙ্গরেরা সব সময় জাহাজের সহিত একই গতিতে ছুট্‌তে পারে না। যদি কিছু শিকার মেলে এই জন্য বড় বড় বোট বা পালতোলা জাহাজকে এরা প্রায়ই অনুসরণ করে।

স্ত্রী হাঙ্গরেরা সাধারণ মাছের মত অসংখ্য ডিম পাড়ে না, এক সঙ্গে মাত্র দুটি ডিম পারে। এই সকল ডিমের উপরে বালিশের খোলের মত আবরণ থাকে। এই আবরণের উপর থাকে সূতার মত অনেকগুলি শুঁয়া। এই শুঁয়াগুলি সমুদ্রের তলায় আগাছায় আটকে যায়, তাতে ডিম একজায়গায়

জড়ানো থাকে। কিছুকাল পরে এই আবরণ ছিঁড়ে একটি পূর্ণাবয়ব হাঙ্গর-শিশু বেরিয়ে আসে এবং মা-বাপের মত নিষ্ঠুর হিংসা কার্য্যে রত হয়।
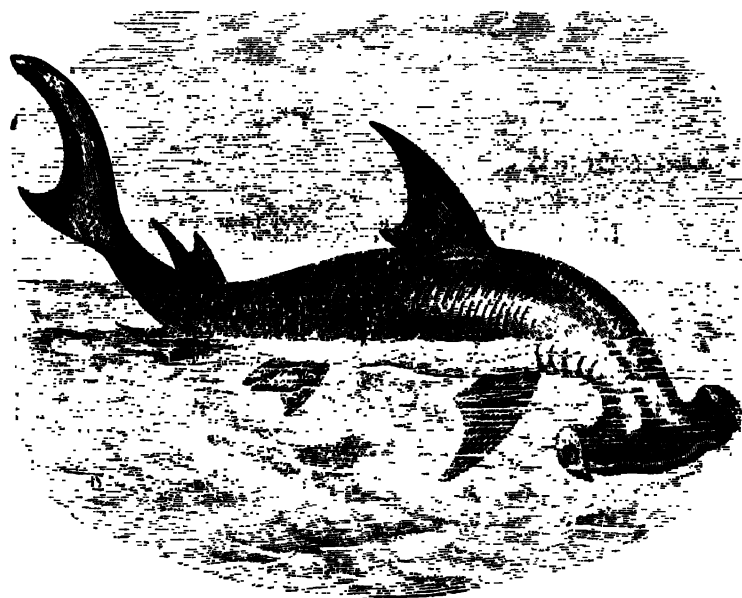
হাতুড়ির মত মাথাওয়ালা হাঙ্গর

সমুদ্রে অনেক রকমের হাঙ্গর আছে। একরকম নীল হাঙ্গর আছে তা'রা দেখতে ভারী সুন্দর। তাদের পিঠ নীল ও

সবুজে মাখা; আর পেটের দিক সাদা ধপ্‌ধপে। এরা লম্বায় মাত্র ৮ ফিট্ হয়। এদের চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু স্বভাব ভারী হিংস্র। এরা সাধারণতঃ মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে।

আর একরকম হাঙ্গর আছে, তার নাম খেঁকশিয়ালী হাঙ্গর। এদের মুখখানা দেখ্‌তে ঠিক খেঁকশেয়ালীর মত। এরা লেজ দিয়ে জলে আঘাত করে মাইলের পর মাইল সাদা ফেনায় ঢেকে দেয়।

এরা একশ্রেণীর তিমির শত্রু। কিন্তু কখন একা আক্রমণ করে না, জোড়ায় বা তিন চারটি মিলে আক্রমণ করে।

হাতুড়ির মত মাথাওয়ালা আর এক রকম হাঙ্গর আছে। এর মাথাটি ঠিক হাতুড়ির মত। এই হাতুড়ীর দু'দিকে দুটি চোখ আছে।

এই ভয়ঙ্কর জন্তুটিকে ভারত মহাসাগরে ও ভূমধ্য সাগরে দেখা যায়। এরা প্রবাল দ্বীপের কাছে বাস করে। হাতুড়ি হাঙ্গরগুলো যেমন কুৎসিৎ, তেমনি ভীষণ।

ম্যাকরেল মাছের মত একরকম মাছ এই সকল হাঙ্গরের পিছু পিছু দেখতে পাওয়া যায়। 'যদি হাঙ্গরের কিছু উচ্ছিষ্ট পাওয়া যায়' এই আশায় এরা হাঙ্গরকে অনুসরণ করে।

আর এক রকম মাছ আছে, তাদেরও হাঙ্গরের মধ্যে ধরা হয়। একে বলে করাত মাছ। এরা ঠিক হাঙ্গরের মতই হিংস্র। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ এদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না।

এরাও তরোয়াল মাছের মত তিমি মাছকে আক্রমণ করে

এবং এই বৃহৎ জন্তুর পেটের মধ্যে করাত চালিয়ে দেয়। কখনো কখনো জাহাজের গায়েও এরা করাত চালায়।
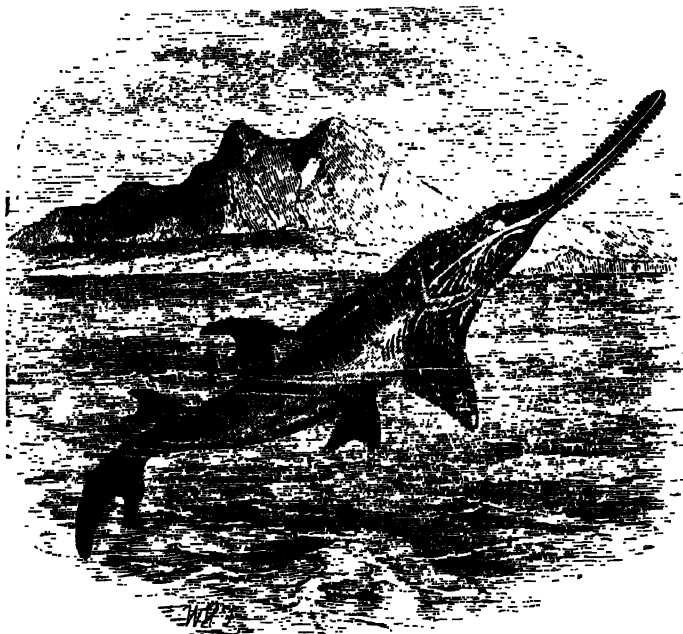
করাত মাছ

তোমরা হয়তো ভাবছ কেমন করে এরা তিমি মাছের পেটে বা জাহাজের তলায় করাত চালায়! এই ভীষণ জন্তু এমন তীব্র গতিতে আক্রমণ করে যে কিছুতেই এর গতিরোধ করতে পারা যায় না।

কড্ মাছ

এবার এমন একটা মাছের কথা বলবো, যার নামের সঙ্গে তোমরা সকলেই পরিচিত। এই মাছটির নাম কড্।

কডমাছ ভারী লোভী। কেবল লোভী নয়, ভয়ানক
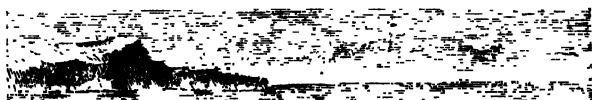
কড্ মাছ

পেটুকও। খাবার জন্যে কডের মস্ত বড় মুখখানা সর্ব্বদাই 'হাঁ' হয়ে থাকে। এরা শিশি, বোতল, মোমবাতি, কাগজ প্রভৃতি সমুখে যা পায়, তাই গিলে ফেলে। ভাবছ, সমুদ্রে এ সব আসবে কোথা থেকে? এ সব জিনিষ জাহাজ থেকে

অনেক সময় নাবিকরা জলে ফেলে দেয়। অনেক কডের পেট থেকে এই সব জিনিষ পাওয়া যায়।

এক রকমের কড্ মাছ আছে, তাদের পেট ও হাঁ হয় খুব বড়। এই ধরণের একটা কডের পেট থেকে একবার এর দ্বিগুণ লম্বা একটা মাছ পাওয়া গিয়েছিল! কথাটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একটা হাতখানেক মোটা সাপ হাত চারেক মোটা হরিণকে গিলে খায় একথাটা কি করে বিশ্বাস কর? অতি সহজেই এরা খোলা সুদ্ধু কাঁকড়া খেতে পারে। এদের হজম করবার শক্তি এত বেশী যে, খোলাতেও এদের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এদের প্রধান খাদ্য ছোট ছোট মাছ।

এই সঙ্গে তোমাদের বলে রাখি সাধারণতঃ মাছদের হজম করবার শক্তি এতো বেশী যে, তা' তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। এরা খাবার দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে পূরে দেয় এবং কখনো কখনো আস্ত আস্ত প্রাণী গিলে খেয়ে ফেলে। খাবার পেলে এরা কখনো ছাড়ে না। অনবরতঃ এদের মুখ খোলা আছে। 'ক্ষিদে নেই' একথা মাছ কখনো বলে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মাছের কখনো পেটের অসুখও করে না!

কড্ মাছ পেটুক হলে কি হয়, এরা ভারী উপকারী; এরা এক সঙ্গে যে কত ডিম পাড়ে তা' শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এক একটা কড্ এক সঙ্গে ৩০ লক্ষ ডিম পাড়ে! সুতরাং কড মাছ কখনও নির্ব্বংশ হবে না। কড মাছের ডিম

জলে ভাসে ; অবশ্য সমুদ্রের লোণা জলে। মিষ্ট জলে (Sweet water) ডিম পাড়লে, ডিম তৎক্ষণাৎ ডুবে যায়। এর কারণ লোণা জলের ভাসিয়ে রাখবার শক্তি বেশী। অনেক সময় ঢেউয়ের সংগে কড মাছের ডিম এসে সমুদ্রতীরে পড়ে থাকে।

কড্ মাছের প্রত্যেক অঙ্গটাই দামী। কড্ মাছ খেতে ভারী মিষ্টি। এর জিব নুন্ দিয়ে জারিয়ে রাখা হয়। লোণা জিব ভারী সুখাদ্য। এর ঝিল্লির টোপ দিয়ে জেলেরা মাছ ধরে। তোমরা "কড্লিভার অয়েল"-এর নাম শুনেছ। এখনকার দিনে বুকের রোগ সারাতে, শরীরকে পরিপুষ্ট করতে কড্লিভার অয়েল অদ্বিতীয় ওষুধ।

নরওয়েতে জেলেরা গরুকে কড্ মাছ খাওয়ায়। কড্মাছ মিশ্রিত সমুদ্রের শেওলা নাকি ওই দেশের গরুর ভাল খাবার। এতে গরু বেশী দুধ দেয়।

আইস্ল্যাণ্ডেও কড্মাছের কাঁটা গরু-ভেড়া প্রভৃতি পশুরা খেয়ে থাকে। এসব বরফের দেশ, কাজেই গাছ-পালা জন্মায় না—সুতরাং ওদের দেশের গরু-ছাগল এসব খেতেই অভ্যস্ত। কামস্কাট্কার কুকুরেরা এই একই খাদ্য খায়। এমন কি, বরফের সমুদ্রের তীরবাসীরা কয়লার বদলে কড মাছের শুক্নো কাঁটা জ্বালিয়ে তার আগুনে রান্না করে।

সুতরাং বুঝতে পারছ, কত দেশের লোকে কড্ মাছের দ্বারা কত ভাবে উপকার পাচ্ছে।

হেরিঙ মাছ ধরার চেয়েও কড্ মাছ ধরা আরো লাভজনক। এতে যন্ত্র-পাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও বড় বড় নৌকা লাগে অনেক।

আজকাল ইংল্যাণ্ডের মাছ ধরা নৌকোগুলোর মধ্যে কুয়োর মত বড় বড় জলাধার আছে। তাতে করে জ্যান্ত কড্ মাছ ধরে আনা হয়।

"নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড্ ব্যাক" কডের জন্য বিখ্যাত।

যখন মাছ ধরা আরম্ভ হয় তখন সমুদ্রতীরে বহু নৌকো জড় হয়। বৎসরের এই সময়ে এক একদিন এমন কুয়াসা হয় যে খুব কাছের জিনিষও দেখা যায় না; সেজন্য একটা নৌকো আরেকটা নৌকোর ঘাড়ে এসে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। অনেক সময় এমন হয়, পাশের নৌকো থেকে কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু লোক বা নৌকাখানাকে মোটেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জেলেরা ঢাক ঢোল বাজায়, বড় বড় আলো জ্বালে, তবু তাতে কিছু স্থবিধে হয় না। এই জন্যে কড্ মাছ শিকার করা ভারী বিপজ্জনক।

আজকাল কড্ মাছ পোষা একটা সখের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কড্ মাছ ভারী পোষ মানে। যে খাবার দিতে যায় তাকে এরা খুব চিনে রাখে। তা'কে দেখলেই পুকুরের হাজার হাজার মাছ তার দিকে সাঁতরিয়ে আসে।

নানা রকমের ও নানা রঙের কড্ আছে; আবার তাদের আকারও হয় নানা রকম। কড্ শীতপ্রধান দেশের সমুদ্রেই পাওয়া যায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্রে এদের কখনও দেখা যায় না।

সমুদ্র থেকে কড্ মাছ ধরা

যে সকল মাছ নিজেদের বলের মত ফোলাতে পারে

ছবিতে যে সকল মাছ দেখতে পাচ্ছ, ওদের দেখতে ঠিক অতিকায় মাছদের মাথার মত।

ইংরেজীতে এ মাছগুলোকে বলা হয়, সান ফিশ।
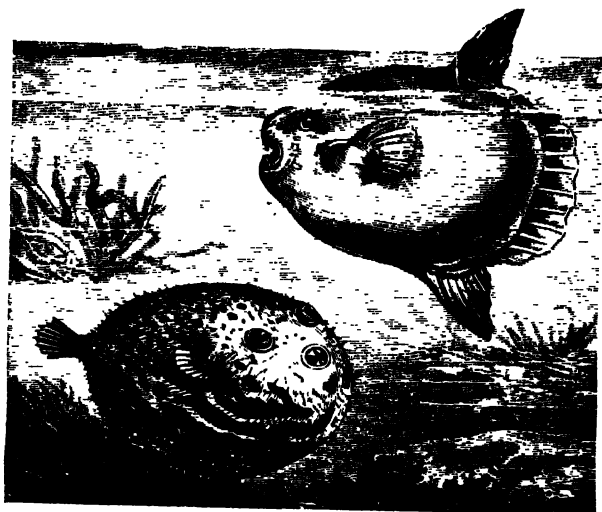
গোলমাছ সূর্য্যমাছ

এদের দেখলে মনে হয়, কেবল মাথা আর ডানা আছে। প্রায়ই জেলেরা দেখ্‌তে পায় এখানে-সেখানে গোলাকার মাছ ভাস্‌ছে—যেন একেবারে মরা।

তারা জানে ও জিনিষটি "সূর্য্য মাছ"। সূর্য্যমাছ শরীরকে প্রায়ই ফুলিয়ে রাখে; আবার যখন দরকার হয়, ঝিল্লি ও মুখ দিয়ে হাওয়া বার করে দেয়। সে সময় মনে হয় যেন ব্লাডার থেকে সোঁ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল।

এই সব মাছ দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে ও ব্রাইটনে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই সূর্য্যমাছের এক জ্ঞাতি আছে তার নাম "গোল মাছ" বা গ্লোব ফিশ্‌। গোল বলেই এর এই নাম। তোমরা অনেকে আমাদের দেশের "ট্যাপা" বা "ভোলা" মাছ দেখেছ। অনেকে এদের মুখে ফুঁ দিয়ে ফানুষের মত ফুলিয়েছ। এদের মধ্যে কেউ কেউ ফুটবলের মত বড়, কেউ বা তার চেয়েও ঢের বড়। এদের সারা শরীরে সজারুর কাঁটার মত কাঁটা আছে। এরাও সমুদ্রের অস্ত্রবিশিষ্ট জীবদের অন্যতম।

কিন্তু এখনো এদের জীবনের সব চেয়ে মজার ব্যাপারের কথাই বলা হয়নি।

এরা ভয় পেলে বলের মত শরীরকে ফুলায়। তখন এর দেহের সমুদয় কাঁটা খাড়া হয়ে ওঠে। এরা ভয় পেলে বা রাগ্‌লে যে জিনিষটি ফুলায়, এটি এদের অনেকগুলি পাকস্থলীর মধ্যে একটি। এদের শরীরটি ফুল্‌লেই এরা উল্টে পড়ে চীৎ হয়ে ভাস্‌তে থাকে। কিন্তু এদের কাঁটাগুলো সব খাড়া থাকে, তাই কোন প্রাণী এদের স্পর্শ করতে সাহস করে না।

একবার একটা গ্লোব মাছকে একটা হাঙ্গরের পেট থেকে জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছিল।

এরা ইচ্ছা করলেই মুখ দিয়ে পেটের সব বাতাস ছেড়ে দিতে পারে। যখন বাতাস ছাড়ে তখন মুখ ও ঝিল্লি দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ হয়।
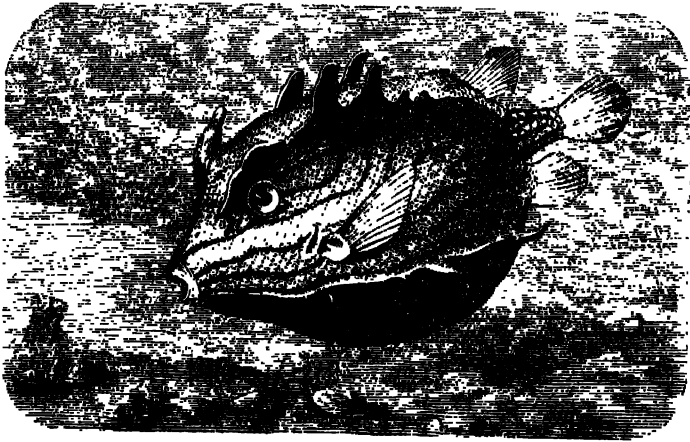
কফার মাছ

নীচের ছবিতে যে মাছটি দেখছ একে "কফার" মাছ বলে।

এরা অন্যান্য মাছের মত ডানা দিয়ে সাঁতার কাটে না। সমুদ্রের বুকে নৌকোর মত হেলতে-দুলতে থাকে।

তোমরা এর চোখের ওপরে ও পিঠে শিঙের মত কাঁটা দেখতে পাচ্ছ?

কাঁটাগুলো ভারী বিষাক্ত। কখন কখন এদের মাংসও বিষাক্ত হয়। এই জন্য এদের কেউ খায় না।

একজন নাবিক এদের মাংস কি রকম খেতে—তা' পরখ করবার জন্য রেঁধে খেয়েছিল। সে ভেবেছিল, লোকে এদের কদাকার চেহারার জন্যই বোধহয় খায় না।

কিন্তু মাছটা খাবার পরই তার মৃত্যু হয়।

নল মাছ

নল মাছগুলো দেখতে ঠিক লম্বা নলের মত। ইংরেজীতে এদের বলে 'পাইপ ফিশ্'। এদের চোয়াল ওপর অংশের সঙ্গে একেবারে জোড়া এবং সারা দেহ কাঁটায় ঢাকা। এদের চেহারা লম্বা নলের মত হলে কি হয়, এরা সারা দেহটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে।

এরা লম্বা নলের মত মুখ দিয়ে ছোট ছোট কীট খেয়ে বেঁচে থাকে।

নল মাছ অনেক রকম দেখ্তে পাওয়া যায়। আমাদের গঙ্গায় সাপের মত এক রকম মাছ আছে, এরাও নলমাছ শ্রেণীর অন্তর্গত।

এরা সমুদ্রের অল্প জলে শেওলার মধ্যে বাস করে।

পর পৃষ্ঠার ছবিতে যে প্রাণীটি দেখছ, ওটিকে বোধহয় তোমরা কেউ মাছ বলেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ওটিও মাছ।

এরাও নল মাছের একটি শ্রেণী। কিন্তু সাধারণতঃ এ মাছকে দেখতে পাওয়া যায় না।

এরা মরে গেলে, এদের শরীর কুঁচকে যায় এবং এদের ঘাড় ও মাথা ঠিক ঘোড়ার মত দেখায়।

এদের ঘাড় ও মুখ ঘোড়ার মত দেখতে বলে লোকে এদের "সমুদ্রের ঘোড়া" বলে। এরা বিশেষ সাঁতারপটু নয়।

একবার এক ভদ্রলোক দুটি সমুদ্রের ঘোড়াকে একটি কাঁচের পাত্রে রেখে এদের চাল-চলন পরীক্ষা করেছিলেন।

কাঁচের পাত্রের মধ্যে রাখবার পর এরা প্রথমে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। কেননা এরা লেজ দিয়ে কিছু জড়িয়ে ধরে নিজেদের খাড়া রাখতে চায়।

সমুদ্র-ঘোটক

কিন্তু যখন কিছু সমুদ্রের শেওলা গ্লাসের মধ্যে ফেলে দেওয়া হোল, তখন এরা খুব খুসী হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ শেওলায় লেজ জড়িয়ে খাড়া হয়ে রইল।

এদের মেয়েরা ডিম পাড়ে ; কিন্তু ডিমগুলি লেজের ওপর বয়ে বেড়ায় এদের পুরুষরা। ডিমগুলো তাদের লেজের চামড়ার ওপর বিঁধে থাকে।

তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, এই সমুদ্রের ঘোড়াটি কেমন করে লেজ দিয়ে সমুদ্রের শেওলা জড়িয়ে ধরে খাড়া হয়ে আছে।

যখন এরা কোন শিকার পায় না—তখন শেওলায় লেজটি জড়িয়ে নিরীহ প্রাণীটির মত চুপ করে থাকে, আর দেখে কোন প্রাণী সেদিকে আসছে কিনা ; যদি কোন ক্ষুদ্র প্রাণীকে কাছে দেখতে পায় তখনি তাকে ধরে ফেলে।

এরা পরস্পরের লেজে লেজ বেঁধে ভারি মজা পায়।

গায়ক মাছ

আমাদের দেশের মাগুর মাছের ডাক হয়ত অনেকেই শুনেছো। তবে সে ডাক খুবই মৃদু। কিন্তু এমন এক রকম মাছ আছে যাদের ধরলেই চীৎকার করতে আরম্ভ করে। আর এক রকম মাছ আছে, যাদের ডাঙ্গায় তুললেই ঠিক কচি ছেলের মত কাঁদে। এই দু রকম মাছ ছাড়া আরও একরকম মাছ আছে, তারা কোন একটা ঋতুতে সাঁতার দেবার সময় এক রকম শব্দ করে। অন্যান্য ঋতুতে চুপ করে থাকে।

এত গেল চীৎকার ও কান্নাকাটির কথা; কিন্তু মাছ গান করে, একথা কখনও শুনেছ? এ যে বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমুদ্রে 'গাইয়ে' মাছ আছে। তবে তাদের গানের ভাষা, সুরের নাম ও কি তালে তারা গায় তা জানি না।

এই মাছগুলোর আকার ছোট; পিঠে নীল দাগ। এরা আমেরিকার দিকে সমুদ্রে বাস করে।

একদিন একজন পথিক সমুদ্র তীরে বিশ্রাম করছিল, এমন সময় তার কানে ভেসে এল মধুর স্বর। তার মনে হোল যেন দূরে কোথায় গান হচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগ্‌লো, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলে না। কাছে একজন মাঝি ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'সে কিছু

শুনতে পেয়েছে কিনা।' লোকটি তখনি বল্লে 'হাঁ—শুনতে পাচ্ছি—একটি মাছ গান গাচ্ছে।'

একথা শুনেই পথিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে তখনই সেই মাঝির নৌকায় উঠে সেই মাছের সন্ধানে রওনা হল। কিছুদূর গিয়েই এক জায়গায় শুনতে পেল, যেন জলের মধ্যে কনসার্ট বাজছে। এই শব্দটাকে দূর থেকে মনে হয় যেন কেউ অর্গান বাজাচ্ছে।

এই সকল গায়ক মাছ সন্ধ্যায় গান গাইতে আরম্ভ করে, এবং সারা রাতই গান গায়। মাছগুলো লাজুক প্রকৃতির নয়—কেউ যদি পাশে এসেও শোনে এরা গান বন্ধ করে না। তবে কেউ গানের ফরমাস করলে, তার অনুরোধও রাখে না।

তারা মাছ

সমুদ্র গর্ভ তারা মাছে পরিপূর্ণ। তারা মাছের ইংরেজী নাম 'ষ্টার ফিশ'। সমুদ্রে যে কোন মাছের বা জন্তুর চেয়ে তারা মাছ সংখ্যায় খুব বেশী। আমাদের ডাঙায় যেমন কাক, শকুনি ও শিয়াল, কুকুর ; সমুদ্রেও তেমনি তারা মাছ। এরা সব কিছু খায়। মৃত দেহ, পচা আবর্জ্জনা যা পায়, তা' খেয়ে সমুদ্রকে পরিষ্কার করে রাখে। সমুদ্রের ছোট ছোট প্রাণীরা তারা মাছকে বড় ভয় করে চলে।

সমুদ্রে এখন যে সমস্ত তারা মাছের বংশ পাওয়া যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরকম ছিল না,—যদিও তাদের সংখ্যা এখনকার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না।

সে সব তারা মাছ আয়তনে বৃহৎ এবং দেখতে অতি সুন্দর ছিল। এদের একটি মিষ্টি নাম ছিল—"পদ্মতারা।"

এখন সেই সকল পদ্মতারার কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় সমুদ্রের তলায় দেখতে পাওয়া যায়। পদ্মতারারা কিন্তু এখনকার তারা মাছের মত সমুদ্রে স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করতে পারতো না।

তারা একটা বোঁটায় আবদ্ধ থাকতো এবং তাইতেই নড়াচড়া করতো। এদের বাহুগুলো লম্বা ও সরু সরু ছিল—ঠিক যেন পালক। এরা যখন ফুটে থাকত, তখন মনে হত, একটি পদ্মফুল ফুটে আছে—এই জন্যেই বোধ হয় এদের নাম হয়েছে পদ্মতারা।

কেবল তাই নয়, এককালে লোকে এগুলোকে সমুদ্রের পদ্ম বলে ভুলও করত।
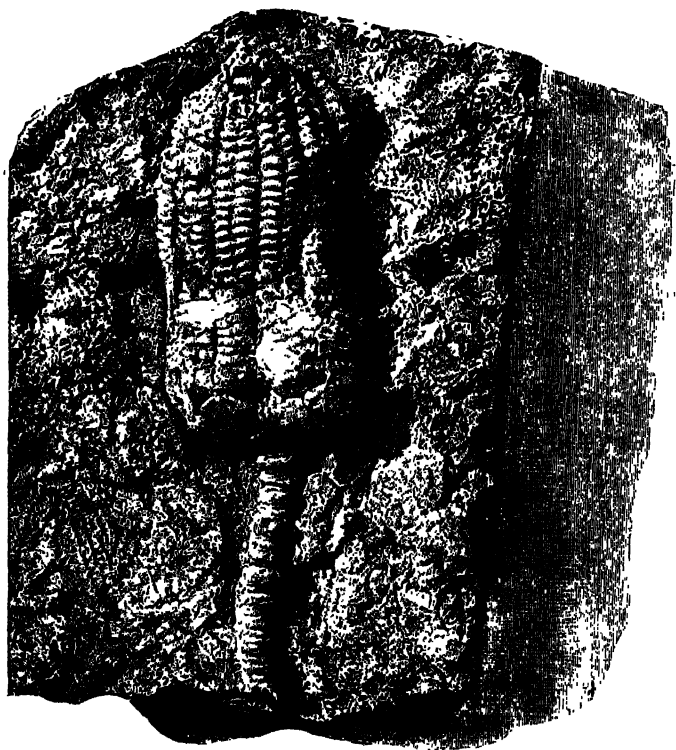
প্রস্তরীভূত পদ্মতারা

এখন এদের বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এদের দেহের গঠন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে এদের কঙ্কাল পাথরের মত শক্ত হাজার হাজার জিনিষে তৈরী।

এখন নানা রকমের তারা মাছ আছে। এক রকম তারা মাছ আছে, তাদের দেহ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তাদের
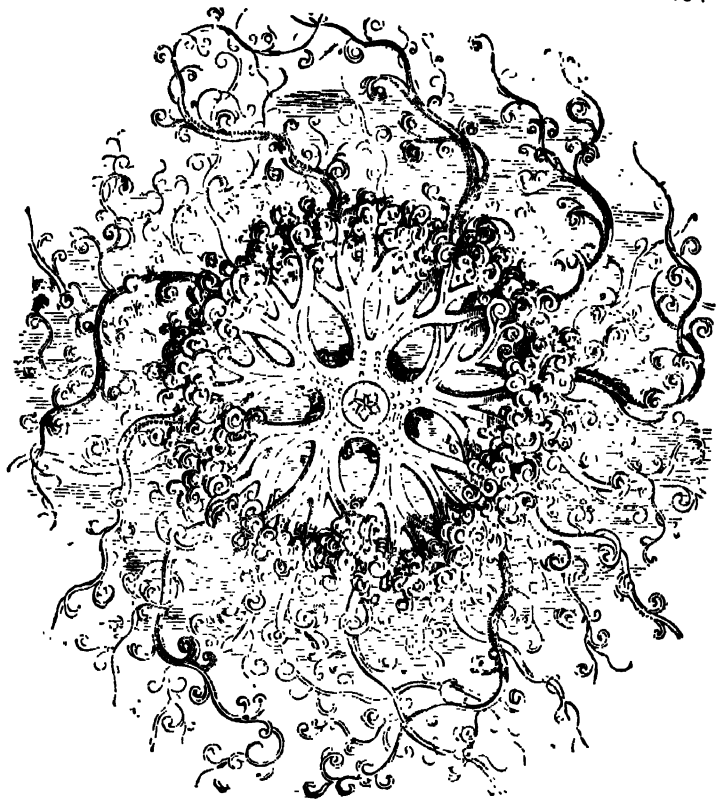
সহস্রবাহু তারা মাছ

প্রধান দেহ থেকে যে সকল বাহু বের হয়, সেগুলো থেকেও উপবাহু, তাদের আবার উপবাহু, এই ভাবে হাজার হাজার

বাহু-উপবাহু বের হ'য়ে থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে, এই শ্রেণীর তারা মাছের আশী হাজার বাহু হয়। এই সকল বাহু দিয়ে এরা হাঁটতে কিংবা সমুদ্রের শ্যাওলায় জড়িয়ে থাক্‌তে পারে।
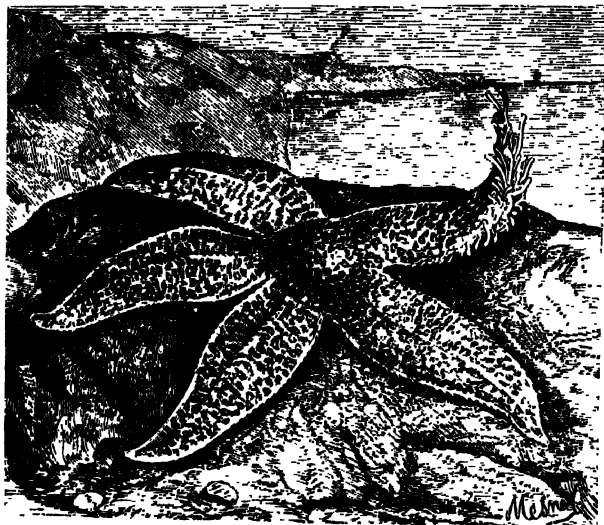
সাধারণ রক্তবর্ণ তারা মাছ

সাঁতার কাটবার সময় এরা সমস্ত বাহু, উপবাহু চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যখন শিকার কাছে আসে তখন এই সকল বাহুর জালে তারা ধরা পড়ে। জেলেরা যেমন জাল গুটিয়ে মাছ ধরে, এরাও তেমনি বাহু গুটিয়ে তাকে মুখে পোরে।

আর একজাতীয় তারা মাছ আছে, তাদের শরীর খুব

ঠন্‌কো। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদ্ধ ডাঙ্গায় তোলা যায় না। ডাঙ্গায় উঠ্‌লেই এরা এক এক করে সমস্ত বাহুই খসিয়ে ফেলে।
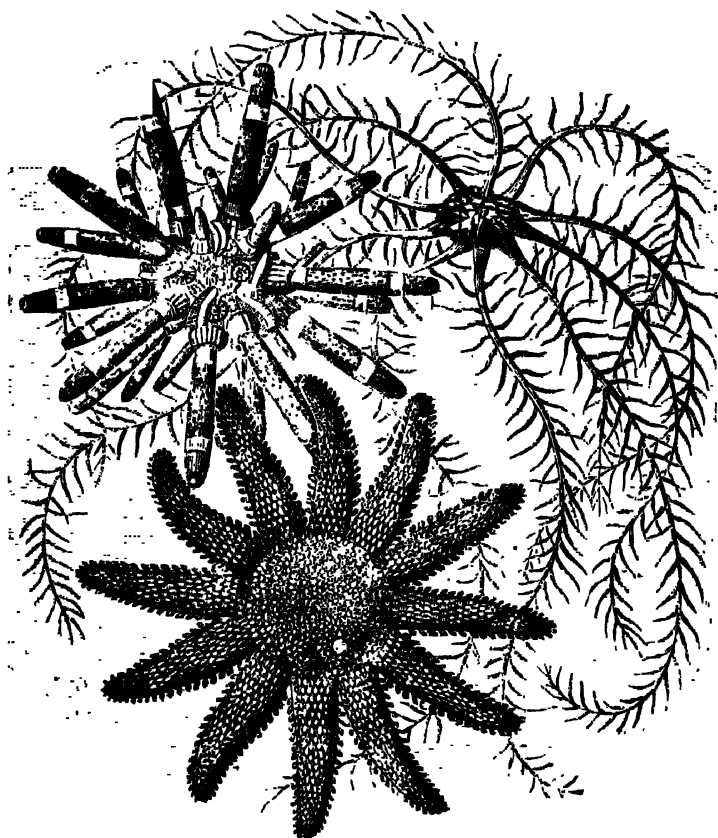
নানা প্রকারের তারা মাছ

এদের বাহু ঠিক সাপের দেহের মত লম্বা ও নমনীয়

বাহুগুলোকে এরা ইচ্ছানুসারে পা কিম্বা ডানার মত স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে।

এদের শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে তৈরী এবং মুখে অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ত্ত আছে। এই সকল গর্ত্তের ভিতর আবার আছে খুব ছোট ছোট জিব। শিকার মুখের কাছে এলে এরা এইগুলি বের করে দেয়, আর যতক্ষণ শিকারটি সম্পূর্ণ করায়ত্ত না হয় ততক্ষণ এদের জিবের কাজ থামে না।

এদের শরীর অনেক রংএর এবং অনেক ধরণের হয়। সেইজন্যে এরা দেখতে ভারি সুন্দর। এদেরও ধরে আস্ত অবস্থায় ডাঙায় আনা যায় না। এদের ছুঁলেই বা এদের কাছে এলেই এরা আপন আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসাতে আরম্ভ করে এবং শেষকালে এমন হয় যে, শরীরের আর কিছুই থাকে না।

কাট্‌ল মাছ

সমুদ্রের কোমলদেহী প্রাণীদের দলবল বড় কম নয়। এদের মধ্যে নানা শ্রেণীর এবং নানা আকার-প্রকারের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়।
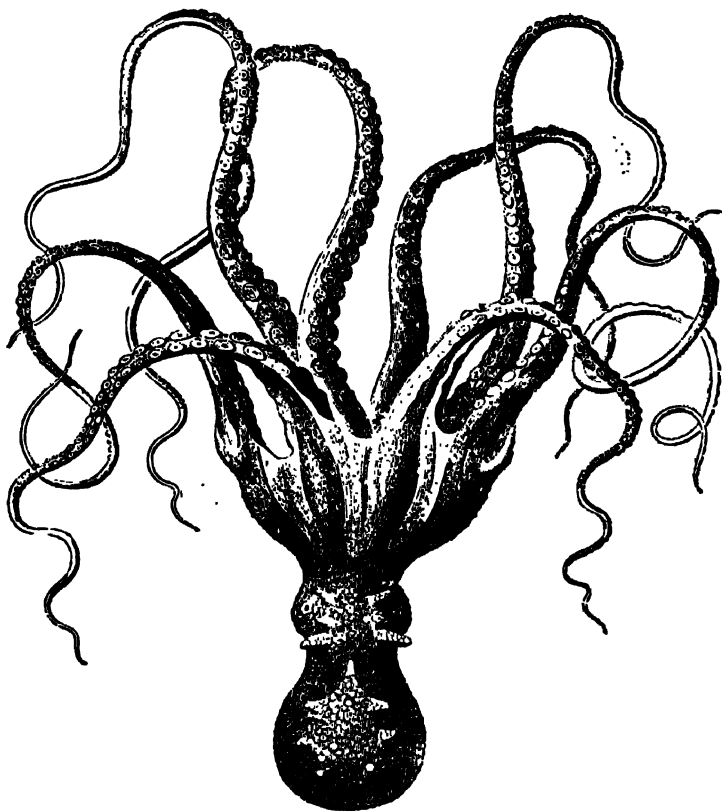
এই শ্রেণীর এক ভীষণ প্রাণীর কথা বলবো যার নাম

তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। এদের বলা হয়—কাট্‌ল মাছ। মাছগুলোর আছে কেবল একটি মাথা আর আটখানি পা। অবশ্য ছবিতে এর মাথার নীচে যা দেখছ, তা মাছের পাকস্থলী।

এদের পা-কে হাতও বলতে পারো। এইগুলোর সহায়তায় এরা সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করতে পারে, আবার শিকার ধরতেও এইগুলো এদের প্রধান অস্ত্র।

এই রকম হাত দিয়ে যদি এরা জড়িয়ে ধরে, তখন ব্যাপার-খানা কি দাঁড়ায় ভেবে দেখ দেখি?

কখনো কখনো কাট্‌ল মাছের পাল্লায় মানুষকেও পড়তে হয়।

পৃথিবীর এক এক অংশের কাট্‌ল মাছ দেখতে বড় ভয়ঙ্কর হয়; আর তারা আকারেও হয় খুব বড়।

তোমরা কাট্‌ল মাছের বাহুতে চোখের মত কতগুলি দাগ দেখছ। আগে লোকে ভাবতো এগুলো ওদের জিভ আর ওদিয়ে ওরা শিকারের রক্ত চুষে খায়। কিন্তু সেকথা সত্য নয়। এগুলোর সাহায্যে এরা শিকারকে দৃঢ় ভাবে জড়িয়ে ধরে। এত দৃঢ় ভাবে জড়ায় যে শিকারের তা' থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা থাকে না। এই চোখের মত যন্ত্রগুলি যেন এক একটি পেশীযুক্ত চামড়ার বাটি। বাটিগুলোর চারিদিকে মোটা মাংসের বন্ধনী আছে।

এরা যখন শিকারকে জড়িয়ে ধরে তখন মাংস-পেশীর

বাটিগুলির মধ্য থেকে সমস্ত বাতাস বার করে দেয় ; তার ফলে এই মোটা মাংসের বন্ধনী শিকারে গায়ে দৃঢ় ভাবে আটকে যায়।

একজন ডুবুরিকে কাট্‌ল মাছ আক্রমণ করেছে

এরা এমন জোরে জড়িয়ে ধরে যে, হাতগুলো কেটে না ফেল্লে কারো সাধ্য নেই যে, সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

কাট্‌ল মাছের শরীরে শক্ত হাড় আছে তবুও এদের মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। তারা-

মাছের মত এরা শরীরের ভেতর একপ্রকার দ্রব্য ক্ষরণ করে। শরীরের সঙ্গে অবশ্য এই শক্ত জিনিষটার কোন সম্বন্ধ নেই। এরা হাড়ের মত নিজেরা বাড়ে না; কতকগুলি পাথরের মত টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে।

কাট্‌ল মাছের হাড় অনেকটা বর্শার আকারের এবং খুব বড়। দেখ্‌লে মনে হয়, এমন একটা ভারী জিনিষ নিয়ে সাঁতার কাটা এদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু আসলে জিনিষটা খুব হাল্‌কা। এতে এদের সাঁতার কাট্‌তে কোন অসুবিধে হয় না।

কাট্‌ল মাছেরা ঝিল্লির সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এই ঝিল্লি দেহের মধ্যে লুকান আছে।

তারা মাছের মত এদেরও সমুদ্রে যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। কাট্‌ল মাছের অনেক শ্রেণী আছে। পল্প্‌ বলে একটা শ্রেণী আছে তারা দেখতে যেমন কদাকার তেমনি হিংস্র। এরা সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কিনারায় বাস করে। মাছগুলো বড় পেটুক। বাঘের মত শিকার দেখলেই তাকে হত্যা করে —খাক্‌ আর নাই খাক্‌।

কিন্তু কাট্‌ল মাছেরও শত্রুর অভাব নেই। মানুষ, বড় বড় মাছ ও উড়োমাছ—এরা সব এদের শত্রু। অনেক লোক কাট্‌ল মাছের মাংসও খায়।

কাট্‌ল মাছের শত্রুর অভাব নেই বটে, কিন্তু প্রকৃতি এদের

পল্প্ বা অক্টোপাস

আত্মরক্ষার জন্য বাহু ছাড়াও অন্য উপায় দিয়েছে। কালীর মত তরল পদার্থে পূর্ণ একটি থলি এদের শরীরের মধ্যে আছে। যদি এরা ভয় পায় তখন জলে খানিকটা কালী ছেড়ে দেয় এবং তাতে জল এত কাল হয়ে যায় যে এদের দেখা যায় না। তখন এরা এই কাল পর্দ্দার আড়ালে আড়ালে গভীর জলে পালিয়ে যায়।

এই কালীকে সেপিয়া (Sepia) বলে। যারা ছবি আঁকে তাদের কাছে এই কালী খুব দরকারী। কাট্‌ল মাছের হাড়ও নানা কাজে লাগে। হাড় গুঁড়িয়ে দাঁতের মাজন এবং হাড় রবারের মত কালির দাগ তোলবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রের কোন কোন অংশে অতিকায় কাট্‌ল মাছ দেখতে পাওয়া যায়। জাহাজের একজন অধ্যক্ষ একসময় একটা অতিকায় কাট্‌ল মাছ দেখেছিলেন। তার সাপের মত বড় বড় বাহুগুলি তখন সমুদ্রের জল তোলপাড় করছিল।

কাট্‌ল মাছ সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তারা নাকি তাদের বড় বড় বাহু দিয়ে মাঝে মাঝে জাহাজ জাপটে ধরে সমুদ্রের তলায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। অবশ্য এ যদি সত্য হয় তা হলে হয়তো সেকালের ছোট ছোট জাহাজের কথাই হবে।

কাট্‌ল মাছে ও তিমিতে অনেক সময় লড়াই বাধে। স্পারম-তিমির একটি প্রিয় খাদ্য কাট্‌ল মাছ। যুদ্ধটা বাধে তিমি যখন তার শিকার ধরে।

আরগোনট্

কাট্‌ল মাছের বংশে আর এক রকম মাছ আছে। কিন্তু তারা কাট্‌ল মাছের মত এত কুৎসিৎ ও ভয়ঙ্কর নয়।

এই শ্রেণীর মাছ প্রকৃতিদত্ত সুন্দর গৃহে বাস করে। এরকম ঘর-বাড়ী মানুষের কাছে চিরকালই বিস্ময়ের বিষয়।

এই মাছগুলোকে বলে আরগোনট্; এরা শামুকের মত শক্ত খোলার মধ্যে বাস করে।

সুন্দর গৃহবাসী হলেও এরা আসলে কাট্‌ল মাছ; কাট্‌ল মাছের মত এদেরও লম্বা লম্বা বাহু আছে।

এরা খুব আল্‌গা ভাবে খোলার মধ্যে বাস করে। কেবল একজোড়া মাংসপেশীর দ্বারা এরা খোলার মধ্যে আবদ্ধ।

দূর থেকে আরগোনট্‌কে ঠিক নৌকোর মত দেখায়। এরা যে কেবল সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়—তা নয়, সমুদ্রের তলায়ও চরে বেড়ায়। তখন এদের লম্বা বাহুগুলো পায়ের কাজ করে।

কাট্‌ল মাছের মত এরা বাতাসের থলির সাহায্যে জলে ভাসে এবং লম্বা লম্বা বাহুর দ্বারা সাঁতার কাটে। এদের প্রায়ই জলের ওপর ভাস্‌তে দেখা যায়। কিন্তু ভয় পেলেই এরা খোলার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তখন খোলার সমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা উল্‌টে সমুদ্রের তলায় ডুবে যায়। এইজন্য আরগোনেট্‌কে ধরা বড় কঠিন।

পাখার মত বা পাল-তোলা জাহাজের পালের মত এর যে হাত দুটি দেখছ তাদের উপরি-ভাগটি আসলে পাতলা চামড়া।
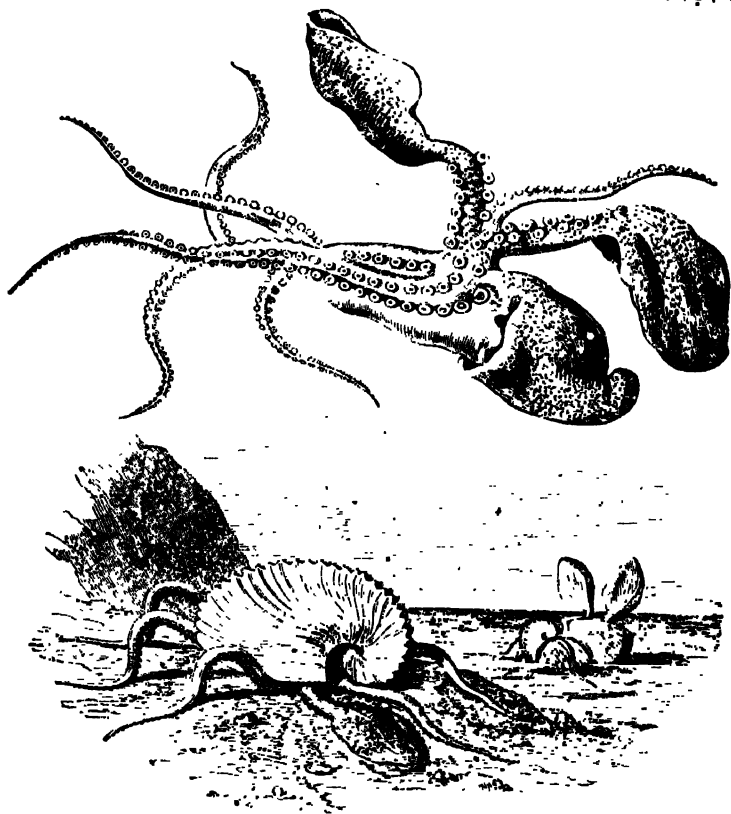
এই পাতলা চামড়াটাকে দূর থেকে লোকে ভাবতো এদের পাল। কিন্তু এরা কখনো এই বাহু দুটি এই কাজে ব্যবহার করে না।

কখনো কখনো এই দুটি বাহু দিয়ে এরা সমস্ত খোলাটি ঢেকে রাখে। এর ফলে খোলাটি মানুষের বা অন্য জন্তুর দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

পালের মত এই দুটি এদের কি কাজে লাগে তা বহু কষ্ট ও পরীক্ষার ফলে জানা গেছে।

বাহু দুটির দ্বারা এদের সুন্দর খোলাটি নির্ম্মিত হয়। যে মাল-মশলা দিয়ে খোলাটি নির্ম্মিত হয়, এরা সেই সব খোলার চারদিকে জড় করে এবং তার সাহায্যে খোলাটিকে বড় করে তোলে। এই ভাবেই এদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলাটি বাড়তে থাকে। যদি খোলাটি কখনও ভেঙ্গে যায়, তা' হলে হাত দুটি আবার তা নতুন করে তৈরী করে বা জোড়া দেয়।

সবেমাত্র ডিম থেকে বেরিয়েছে এমন কতকগুলি আর-গোনট্ নিয়ে একজন স্ত্রীলোক পরীক্ষা করেন। তিনি প্রত্যহ এদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

তিনি দেখলেন, কেমন করে দুটি বাহু দিয়ে আরগোনট্‌রা খোলা তৈরী করে। যখন খোলাটি সম্পূর্ণ ভাবে তৈরী হোল, তখন তিনি এক পরীক্ষা করলেন।

তিনি খোলাটি ভেঙ্গে দিলেন। এর ফলে কি হোল তা' পরের দিন দেখতে গেলেন। দেখলেন, মাকড়সার জালের মত একটা জিনিষ ভাঙ্গা খোলার ওপরে পাতা রয়েছে এবং এই মাকড়সার জালটি ভাঙ্গা অংশের দুটি ধারে খুব

আলগা ভাবে আটকে আছে। তার পরের দিন আবার গিয়ে দেখেন, এই জিনিষটি একটু পুরু হয়েছে এবং এর দুটিধার একটু দৃঢ়ভাবে আটকে আছে। দিনের পর দিন মেরামতের কাজ চলতে লাগলো এবং এই জিনিষটি ক্রমে ক্রমে বেশ পুরু হয়ে উঠতে লাগল। এমনি ভাবে খোলাটির মেরামত শেষ হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটি দেখেছিলেন—যে জিনিষটি দিয়ে মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে তা' তাদের বাহু থেকেই উদ্ভূত।

আরগোনাটুরা সমুদ্রের তলাতেই বিচরণ করে। কেবল অসুস্থ হলে বা ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রকোপে কখনও কখনও জলের ওপরভাগে ভাস্‌তে থাকে। আসলে এরা সমুদ্র-তলবাসী।

মুক্তা

ঝিনুকের ভেতরে মুক্তা থাকে। মুক্তার আদর মানুষ চিরকাল করে আস্ছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে, কারো কাছে মুক্তার আদর কমে নি। জিনিষটি অবশ্য ধনী ও রাজা-রাজড়ার ঘরেই শোভা পায়। একটি মুক্তাদানা সংগ্রহের জন্য মানুষ কি না করে? চুরি, ডাকাতি, জাল, হত্যা, এমন কি সমুদ্রের জলে পর্য্যন্ত ডুব দেয়।

কিন্তু আসলে জিনিষটা কি? ঝিনুকের লালা। তাই সাত আট বছরে এক বিশেষ অবস্থায় একটু একটু করে জমে মুক্তার সৃষ্টি করে।

আমাদের চোখে যদি একটি বালির কণা পড়ে, তাহলে চোখে কত যন্ত্রণা হয়। বালিটিকে বার করে দেবার জন্যে চোখে আপনা থেকেই জল কাটে; আমরাও নানা রকম করে বালু কণাটিকে বার করবার চেষ্টা করি।

ঝিনুকের শরীরে যদি কোন বালু কণা বা কোন শক্ত জিনিষ ঢুকে যায়, তাহলে বেচারীদের কোমল শরীরে বড় আঘাত লাগে এবং জায়গাটিতে ক্ষত হয়। তার ফলে বড় যন্ত্রণা হয়; কিন্তু তার এমন উপায়ও নেই যে জিনিষটিকে বার করে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। সেইজন্য জিনিষটিকে লালা দিয়ে ঢেকে দেয়। একাজ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে চলে। এই সময়ের মধ্যে বালুকণাটি কোনকালে ঢেকে

যায়, তবুও ঐ কাজটি থামে না। এমনি করে একটি মুক্তার সৃষ্টি হয়, ঝিনুক তা জানতেও পারে না। শেষে একদিন কোন ডুবুরি এসে তাকে ওপরে তুলে তার পেটের ভেতর থেকে মুক্তাটি বার করে নেয়।

সব ঝিনুকের পেটে মুক্তা থাকে না এবং মুক্তা-ঝিনুক গভীর জলের প্রাণীও নয়। সাধারণতঃ বিষুবরেখার কাছের সমুদ্রেই মুক্তাবাহী ঝিনুক পাওয়া যায়।

চীনেরা কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা তৈরী করতে পারে। কেবল চীনেরা কেন, অনেক দেশেই আজকাল কৃত্রিম উপায়ে ঝিনুকের পেটে মুক্তা তৈরী হচ্ছে। তারা এক টুকরো কাঁচ ঝিনুকের ভেতর পূরে দেয়।

প্রাণীটা কাঁচটুকরোকে ঢেকে ফেলবার জন্যে তার ওপর মুক্তারস নিক্ষেপ করে। শত্রুকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা এদের নেই, এরা তাকে কেবল লুকিয়ে ফেলতে পারে।

মুক্তাপ্রাণীর শুক্তির ওপরে রঙিন্ একটা পদার্থ থাকে তাকে বলা হয় মাদার-অব-পার্ল।

মুক্তা তোলা খুব একটা হৈ চৈ-এর ব্যাপার। সিংহলের উপকূলভাগ মুক্তা তোলার জন্য বিখ্যাত।

যখন সিংহলের উপকূলে মুক্তা তুলবার আয়োজন হয়, তখন ছোট খাট অনেকগুলি কুঁড়েতে তীরটি ছেয়ে যায় এবং দলে দলে বণিক, ডুবুরি ও বাজে লোকে স্থানটি সরগরম হয়ে পড়ে।
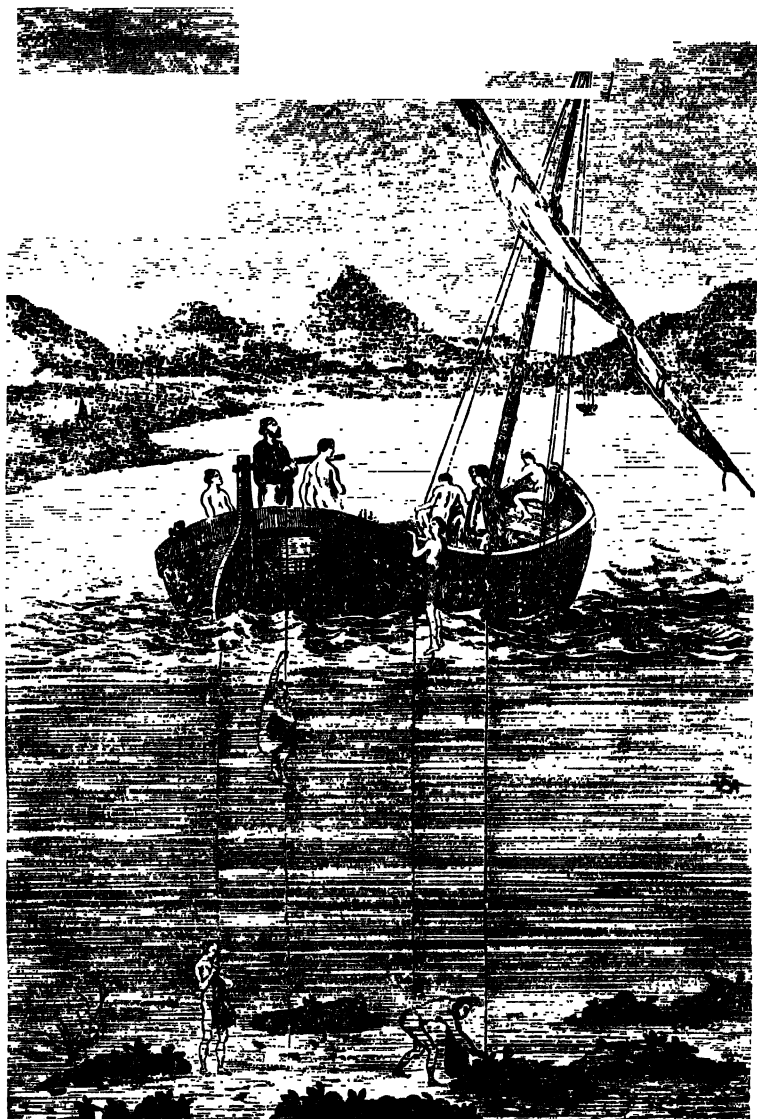
সমুদ্র হ'তে মুক্তা তোলা

এই সব ভিড় দেখলেই বোঝা যায়, মুক্তা তুলবার আয়োজন হচ্ছে।

মুক্তা তোলা বড় সোজা ব্যাপার নয়!

ডুবুরিদের বেশীর ভাগই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে না! তা'রা
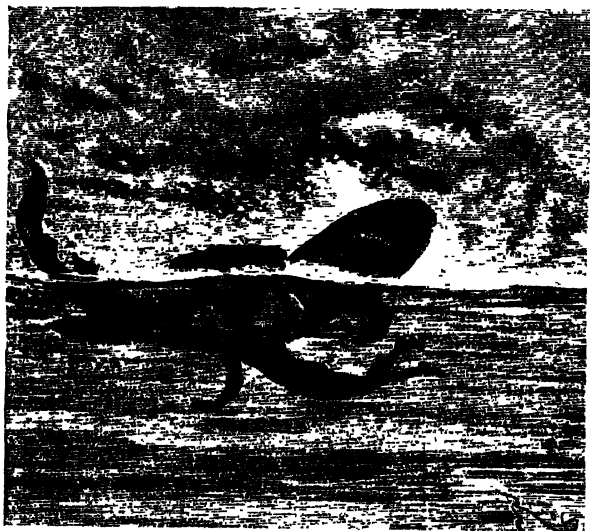
ডুবুরিকে হাঙ্গরে ধরেছে

সাধারণতঃ অন্ধ হয়ে পড়ে, এবং তাদের গায়ে ফোঁড়া হয়। কেউ কেউ জলের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়; আবার কাউকে কাউকে হাঙ্গরেও খেয়ে ফেলে।

সুতরাং বুঝতে পাচ্ছ মুক্তা তোলা বড় নিরাপদ ব্যাপার

নয়। সকাল সাতটা থেকে মুক্তা তোলা আরম্ভ হয়। অনেকগুলি খুঁটি নৌকোর দু'পাশে বাঁধা থাকে। সেখান থেকে মোটা মোটা দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়! এই দড়ির উপর দিকটি একটি ফুটোওয়ালা পাথরের ভেতর দিয়ে গলিয়ে পাথরটির দু'পাশে গেরো বাঁধা থাকে, তাতে করে ডুবুরি এই পাথরে পা' দিয়ে দিব্যি দাঁড়াতে এবং ডুববার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

তারপর মুক্তার জন্য ঝুড়ি নিয়ে ডুবুরি সেই দড়ি ধরে জলের তলায় ডুব দেয় এবং আধ মিনিটের মধ্যে ঝুড়িটি ভর্ত্তি করে দড়ি ধরে উপরে উঠে পড়ে। এরা একসঙ্গে চার পাঁচজন নীচে নামে।

এই ভাবে প্রায় মাসখানেক মুক্তা তোলা চলে। যতদিন মুক্তা তোলা চলে ততদিন খুব হৈ-হৈ ও গণ্ডগোল হয়।

সমুদ্রের পাখী

পাখী

বনে জঙ্গলে হাজার হাজার পাখী উড়ে বেড়ায় ও বাস করে। মাঠে ঘাটে পথেও আমরা অগণ্য পাখী দেখতে পাই। এরা আমাদের কাছে কাছেই থাকে। এদের মিষ্টি গানে আমাদের মনে কত-না আনন্দ হয়! এদের দ্রুত গতিতে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

মানুষ জাল দিয়ে বা নানা উপায়ে এদের ধরে; কিন্তু এদের সঙ্গে উড়তে পারে না। নীল আকাশে এরা পাখা মেলে কেমন সুন্দর ভাবে দ্রুতগতিতে কতদূর উড়ে চলে যায়।

লাল, নীল, সবুজ কত রকমের পাখী আছে। এরা কি সুন্দর, কি চমৎকার! পাখীরা এত দ্রুতগতিতে ওড়বার শক্তি পায় কোথা থেকে বল্‌তে পার কি?

এ বিষয়ে একটা জিনিষ এদের সাহায্য করে—সে জিনিষটা হচ্ছে অক্সিজেন বা অম্লজান।

এদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যন্ত্রটি সারা দেহে ছড়ান। এদের রক্ত অক্সিজেনে পূর্ণ হয়ে দ্রুতগতিতে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস এদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে

হাড়ের মধ্যেও ঢোকে। সুতরাং এদের ওড়বার শক্তি যতদূর দ্রুত হওয়া সম্ভব ততদূর হয়।

কেবল তাই নয়, এদের শরীরের গঠন, ডানা দুখানি ও লেজও এই সঙ্গে ওড়বার সাহায্য করে। এদের শরীরটি ঐরকম না হয়ে, যদি অন্য কোন রকম হত, তাহলে অত তাড়াতাড়ি ও স্বচ্ছন্দে বাতাস কেটে উড়ে যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হত না। তোমরা অনেকেই এরোপ্লেন দেখেছ। যন্ত্র-গুলো কি কতকটা পাখীর মত কোরে তৈরী নয়?

পাখীর শরীরের উত্তাপ খুব উঁচু ডিগ্রিতে ওঠে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন (জলজান) ও কার্ব্বণ (অঙ্গার) এক সঙ্গে মিলে এমন একটি উত্তাপ তৈরী করে যা' পাখীর দেহেই সম্ভব হয়।

পাখীরা কেমন চঞ্চল আর কাজে ব্যস্ত দেখেছ তো! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা উড়তে থাকে। কোন কোন পাখী সারা দিন রাতে মাত্র দু ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়।

যে পাখীদের ভেতর ও বা'র অক্সিজেনের স্রোতে ভর্ত্তি, তাদের উপযুক্ত কি পোষাক বলতো?—পালক। পালকের চেয়ে হাল্কা ও গরম আর কি আছে?
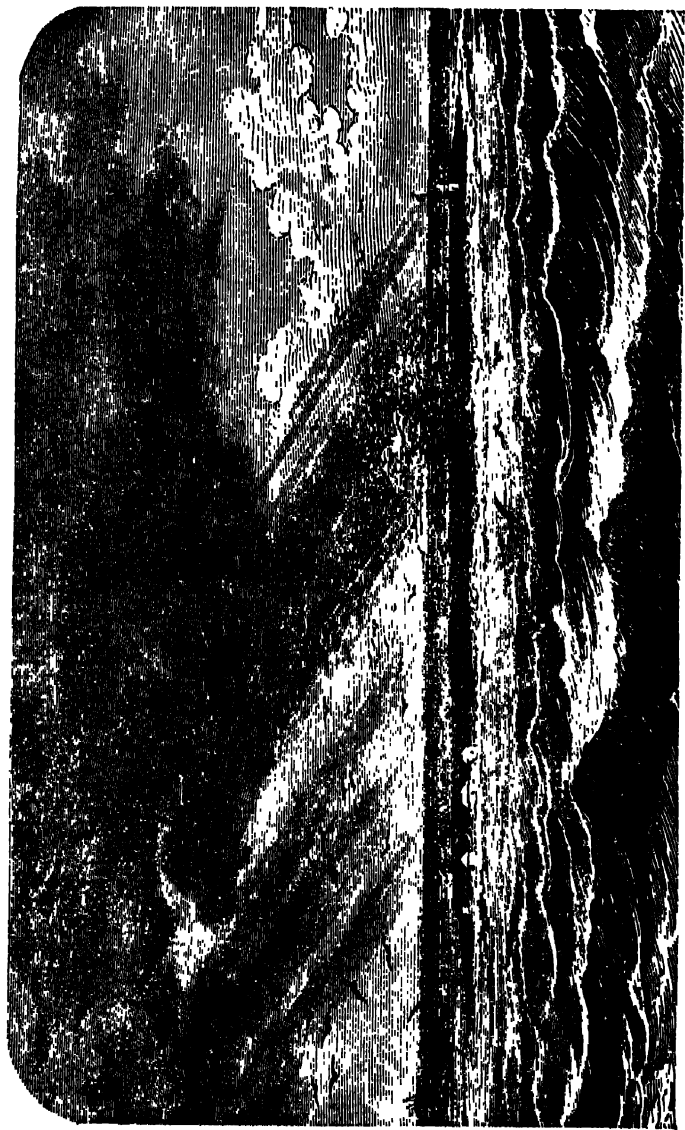
একটি প্রবাল দ্বীপের ওপর র ঝাঁক

সমুদ্রের পাখী

সমুদ্রের প্রত্যেক ছোট ছোট পাহাড় ও ছোট ছোট দ্বীপ নানা রকম পাখীতে ভরা। সমুদ্রের কাছে থাকে বলে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে, সামুদ্রিক পাখী।

যাত্রী জাহাজ অনেক সময় এই সব পাখীর ঝাঁকের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পেট্রেল, গল, এ্যাল্‌বেট্রস্‌, পেন্‌গুইন প্রভৃতি নানাপ্রকারের পাখী সমুদ্রে বাস করে। এরা সমুদ্রের পোকা মাকড়, মাছ প্রভৃতি সব খায়।

কিন্তু সমুদ্রের পাখীদের ও ডাঙ্গার পাখীদের স্বভাবে ঢের পার্থক্য আছে। সমুদ্রের পাখীদের গলার স্বর অতি তীক্ষ্ণ। এরা বাসার জন্য বড় মাথা ঘামায় না।

সামুদ্রিক লার্ক পাখী বালির ওপর ছোট গর্ত্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। কিন্তু এরাও ডাঙ্গার পাখীর মত বাচ্চাদের বড় ভালবাসে।

লার্করা যদি কোন কুকুরকে বাসার কাছে আসতে দেখে, তাহলে বাসা থেকে উড়ে যায় এবং যেন ডানা ভেঙ্গে গেছে এই ভাণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কুকুরটি তার দিকে দৌড়তে আরম্ভ করলেই লার্ক আবার উড়তে থাকে এবং একটু দূরে গিয়ে আবার মাটিতে পড়ে যায়। এই রকম ভাবে সে কুকুরকে

তার বাসা থেকে অনেক দূরে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খুব দ্রুত-গতিতে নিজের বাসায় ফিরে আসে।

পাখীগুলো কতকটা আমাদের দেশের নদীর চরে 'হট্‌টিটি'

সমুদ্রের পাখী

পাখীর মত। সে পাখীগুলোও বালিতে গর্ত্ত করে ডিম পাড়ে এবং তার কাছে কোন মানুষ বা প্রাণী দেখলেই তার কাছ থেকে কিছুদূরে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে "হট টি টি" রবে ডাকতে

ডাকতে ছুটে চলে,—যেন ধরা দেয় দেয়। এমনি করে তাদের ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যায়।

সামুদ্রিক লার্ক তীরে বাস করে। "তীরের পাখী" নামে আর একশ্রেণীর পাখীও এদের মত সমুদ্রতীরে বাস করে। এদের লম্বা পা ও লম্বা ঠোঁট শিকারের সময় ভারী কাজে লাগে। এই "তীরের পাখীদের" এক শ্রেণী আছে, তাদের লম্বা ঠোঁটের আগাটি বাঁকা।

যদি কোন পোকা-মাকড় কোন পাথরের তলায় গিয়ে লুকোয়, এদের বাঁকা ঠোঁটের আগা তখন খুব কাজে লাগে—তা দিয়ে অনায়াসে এরা পাথর উল্টে ফেলে শিকার ধরে।

কিন্তু এরা তো হোল তীরের পাখী,আসল সমুদ্রের পাখী কই ?

সামুদ্রিক পাখীদের অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে দেখতে পাওয়া যায়। এরা সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ আর ফেনাকে বড় ভালবাসে। ভীষণ ঝড়ের সময় এদের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঝড়ো হাওয়ায় ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বহুদূর অবধি ভেসে যায়। এদের পোষাক ও স্বভাবে চমৎকার মিল আছে। এরা ঢেউএর বুকে আর ফেনার মধ্যে বাস করে বলে প্রকৃতি এদের খুব গরম ও পুরু পোষাক দিয়েছে এবং লেজের কাছে তেলের মত চটচটে এক রকম তরল পদার্থ দিয়েছে যা তারা প্রচুর ভাবে গায়ে মাখতে পারে।

কোন কোন সামুদ্রিক পাখীর গা তেলে পরিপূর্ণ। সুতরাং এদের গায়ে হাজারই জল লাগুক না কেন, পালক শুকনো ও শক্ত থাকে।

ফ্রিগেট্ পাখী

ফ্রিগেট্ পাখী মস্ত শিকারী পাখী। এদের ঠোঁট লম্বা ও খানিকটা জোড়া এবং আগাটি বাঁকা। কিন্তু ডানা দুটির শক্তি ভীষণ। ডানা দুটির সহায়তায় এরা যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে। এদের লেজটিও খুব লম্বা।

সাধারণ পাখীর মত এরা মাটি থেকে উড়তে পারে না ;— কোন উঁচু জায়গা বা পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে ওড়ে।

একবার আকাশে উড়তে পারলে হয়। তখন এরা অতি সহজে সুন্দর ভাবে বাতাসে চলাফেরা করতে পারে—যেমন আমরা মাটিতে করি। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে উড়তে থাকে, এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করে না।

নীল আকাশের বায়ু স্রোতই এদের বিশ্রামের স্থান। যখন প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, এলোমেলো বাতাসের প্রবল স্রোতে আকাশ ও সমুদ্র এক হয়ে যায়, তখন এই ফ্রিগেট্ পাখীর কি আনন্দ!

তারা ফেনাওয়ালা ঢেউগুলো ছুঁতে ছুঁতে উড়তে থাকে, এবং জানতে পারে, শীঘ্রই ছোট মাছ ও শামুক সমুদ্রের প্রবল স্রোতে ওপর দিকে ভেসে উঠবে। তাই এরা তখন মজা করে এই মাছগুলি খায়! শামুক পর্য্যন্ত বাদ দেয় না— ভারী পেটুক কি না! তাই ঝড় জল হলে এরা ভারি খুশী হয়।

তোমরা হয় তো বিশ্বাসই করবে না, এরা এদের জোরাল ডানায় ভর করে কতদূর উড়তে পারে। বাতাস যেমন

ফ্রিগ্রেট্ পাখী গল পাখীকে আক্রমণ করেছে

মাইলের পর মাইল বয়েই চলে এরাও তেমনি কখনো ঢেউ

ছুঁতে ছুঁতে, কখনো বা বাতাসে ভাসতে ভাসতে মাইলের পর মাইল উড়ে চলে।

ফ্রিগেট পাখী সাধারণতঃ জলের ওপর ভাগে যে সব মাছ ভেসে ওঠে তাদেরই শিকার করে খায়; কখনও কখনও গ্যানেট নামে অন্য পাখীদের কাছ থেকেও খাবার কেড়ে নেয়।

ফ্রিগেট মাটিতে, গাছের ওপরে বা পাহাড়ের চূড়ায় ডিম পাড়ে; কিন্তু সংখ্যায় তা মাত্র একটি!

ফ্রিগেটদের আর এক নাম—সমুদ্রের ঈগল।

ছবিতে দেখছ, ফ্রিগেট্ পাখী গল পাখীকে আক্রমণ করেছে।

যখন এদের খুব ক্ষিদে পায়, অথচ খাবার কিছু পায় না, তখন এরা ডাকাতি করতেও পেছপা হয় না। বেচারী গল পাখীটি যেই খাবে বলে একটি মাছ ধরেছে অমনি মাছটি গিলে ফেলবার আগেই এই জানোয়ারটি এর ঘাড়ে পড়েছে।

ফ্রিগেট পাখী পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়;—অবশ্য সমুদ্রে।

অ্যাল্‌বেট্রস্‌

অ্যালবেট্রস নামে এক রকম পাখী আছে যাদের সমুদ্রের পাখীদের রাজা বলা চলে।

পাখীগুলো হাঁসের চেয়েও বড়। কথাটা আরও পরিষ্কার
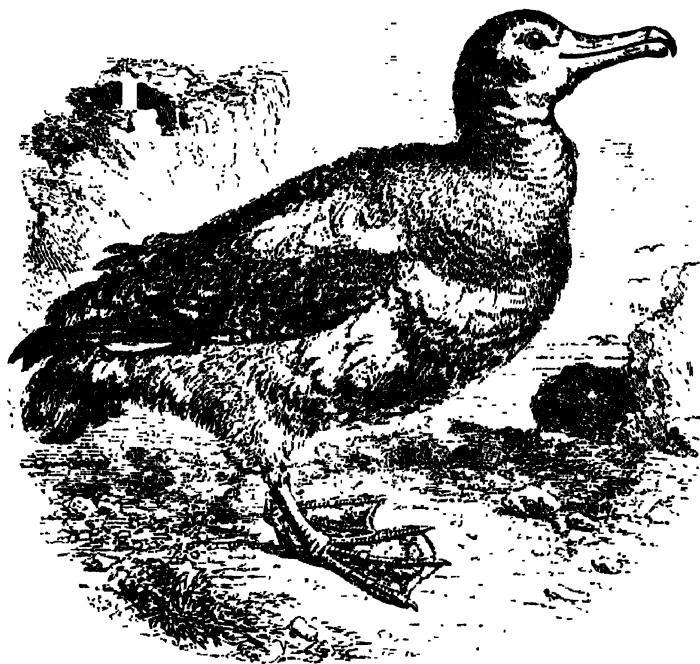
করে বলি, অ্যালবেট্রসের ডানার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত মাপলে হয় এগারো ফিট অর্থাৎ প্রায় ছ'হাত। তবে রক্ষা যে

এদের সকলেই অত বড় হয় না; এদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে, যাদের আয়তন ঐ রকম। পাখিগুলোর দেহ সাদা, ডানা দুটি কাল। এরা হাঁসের মত অনায়াসে সাঁতার দিয়ে এদিকে-ওদিকে স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করতেও পারে। আবার জল না ছুঁয়েই ঢেউএর ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে।

অ্যালবেট্রসরা ঝড়ের কোন তোয়াক্কাই রাখে না। আগে ছোট ছোট জাহাজের নাবিকেরা প্রায়ই দেখতো, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এরা জাহাজকে অনুসরণ করে চলেছে। এজন্য তারা এদের বলতো ভবঘুরে অ্যাল্‌বেট্রস্‌।

উত্তমাশা অন্তরীপ বা কেপ. হর্ণএর কাছের ঝোড়ো সমুদ্র এদের বাসস্থল।

যখন কোন জাহাজ এই সকল অন্তরীপের কাছে আসে, তখন অ্যাল্‌বেট্রস্‌রা ঝাকে ঝাঁকে জাহাজের ওপর এসে পড়ে।

নাবিকেরা এইসব পাখী দেখে বুঝতে পারে তারা কোথায় এসেছে।

যখন এদের ডিম পাড়বার সময় আসে, তখন এরা ডাঙ্গা খোঁজে। সমুদ্রের মাঝে মাঝে ছোট ছোট নির্জ্জন দ্বীপ আছে, সেখানে এরা দলে দলে বাস করে।

শুক্‌নো ঘাস ও পাতা দিয়ে এরা বালির ওপর বাসা বাঁধে।
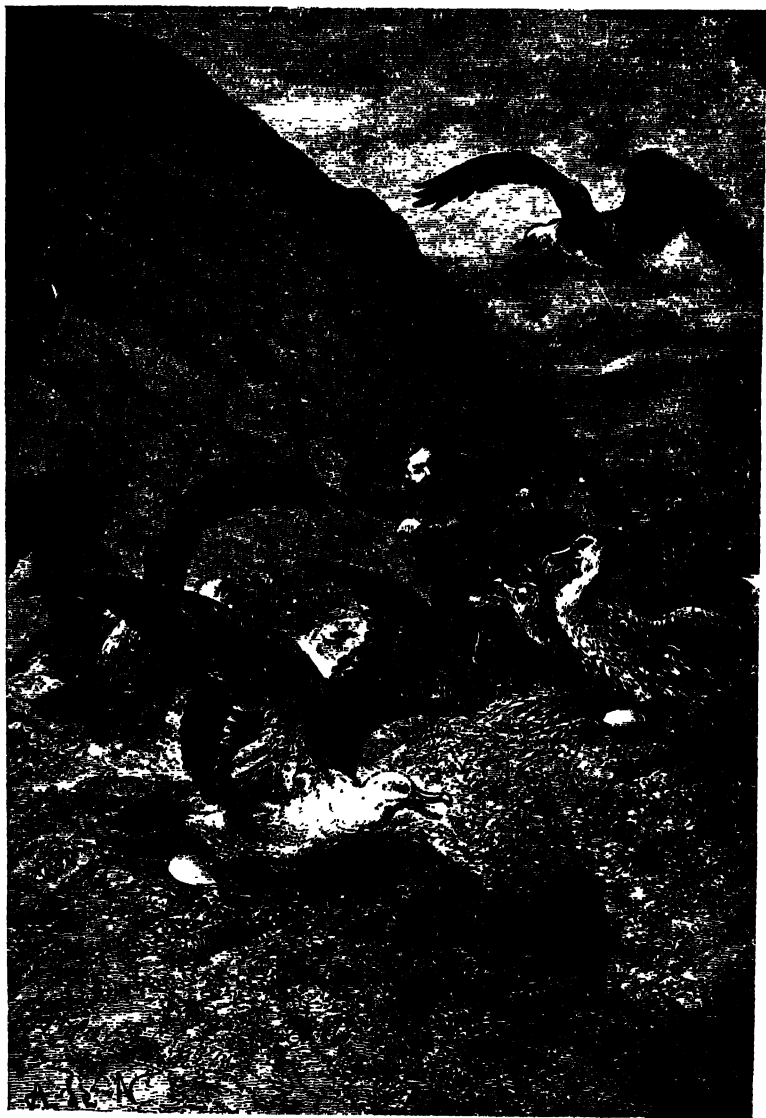
অ্যাল্‌বেট্রস্‌দের বাসা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

মা ডিমের ওপর বসে বসে যখন তা দেয়, তখন বহুদূর থেকে সাদা গম্বুজের মত তার মাথাটি দেখা যায়।

কেউ এদের ডিম চুরি করতে এলে, এরা খুব সাহসের সঙ্গে তা' রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

ছবিতে দেখছ কয়েকটি লোক ডিমের ওপর থেকে কয়েকটা অ্যাল্‌বেট্রস্‌কে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সকলের চেয়ে এদের বড় শত্রু হচ্ছে গল পাখী। গল পাখীরা ভারী ধূর্ত্ত। এরা অ্যাল্‌বেট্রসদের বাসার ওপর লক্ষ্য রাখে। যখন দেখে অ্যাল্‌বেট্রস্‌ পাখীরা বাসা ছেড়ে অনেকদূর উড়ে চলে গেছে, তখন তারা এসে ডিম চুরি করে খায়। সেজন্য অ্যাল্‌বেট্রসরাও খুব সতর্ক থাকে।

অ্যাল্‌বেট্রস্‌দের স্বভাব অনেকটা শকুনের মত। সমুদ্রের কোথাও কোন মরা মাছ বা প্রাণী দেখলেই হয়। এরা তৎক্ষণাৎ উড়ে এসে ভোজে লেগে যায়।

বিশেষ করে যদি তিমি মাছ মরে তাহলে এদের আনন্দের সীমা থাকে না। বহু দূর থেকে গন্ধ পেয়ে এরা দলে দলে তার শরীরের ওপর বসবাস করতে আসে।

এদের বাঁকা ঠোঁট মরা জানোয়ার খাবার পক্ষে খুব উপযুক্ত। কাট্‌ল মাছের কথা তোমরা এখনো বোধহয় ভোলো-নি—তার লম্বা লম্বা দাড়ার কথাও বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। এই মাছটি অ্যাল্‌বেট্রসের ভারী প্রিয় খাদ্য। এরা আবার উড়ো-মাছেরও ভীষণ শত্রু।

ডলফিনদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে যখন উড়োমাছরা আকাশে উড়তে থাকে তখন অ্যাল্‌বেট্রস্‌ পাখী এদের ধরে খায়।

কিন্তু অ্যাল্‌বেট্রস্‌রা একরকম কদাকার পাখীর বন্ধু। তার নাম পেনগুইন্‌। এক সময় নির্জ্জন ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপে পেনগুইন্‌ আর অ্যাল্‌বেট্রস্‌ একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করতো।

অ্যাল্‌বেট্রস্‌ নাবিককে আক্রমণ করছে

অ্যালবেট্রসরা সেখানে লম্বা ও মাটি থেকে ফুট দুই উঁচু বাসা তৈরী করত; আর পেনগুইনরা বাস করত সেই বাসারই

চারধারের গর্ত্তে। কিন্তু মানুষ এসে ক্রমে ক্রমে দ্বীপটি অধিকার করে নিলে। তারপর থেকে এই পাখীরা বহুদূরে বাস করতে চলে গেছে।

তোমরা যদি কেউ কবি কোলরিজের এন্‌সেন্‌ট ম্যারিনারস্ পড়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই জান নিরীহ অ্যাল্‌বেট্রস্ পাখী হত্যা করে জাহাজখানির নাবিকেরা কি দুর্দ্দশায় পড়েছিল। কবি বড় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কাহিনীটি রচনা করিছিলেন।

কিন্তু আসলে অ্যাল্‌বেট্রস পাখী নিরীহ নয়, অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির।

এদের হিংস্রতার একটি ঘটনা বল্‌ছি। একবার এক বেচারী নাবিক জাহাজ থেকে হঠাৎ জলে পড়ে যায়। তাকে জল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তৎক্ষণাৎ বোট নামিয়ে দেওয়া হল। বোটখানা তার দিকে জল কেটে ছুটে চলেছে। সেও প্রাণপণ শক্তিতে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে বোটের আগমন প্রতীক্ষা করছে।

এমন সময় একদল অ্যাল্‌বেট্রস্ পাখী তাকে আক্রমণ করলে।

সে বেচারী হয়তো নৌকো আসা পর্য্যন্ত জলের ওপর মাথা তুলে থাকতে পারতো। কিন্তু তা আর হোল না। পাখীগুলো ডানার ঝাপটা মেরে ও ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে তাকে ক্ষত-বিক্ষত ও অস্থির করে তুললে। সে কি করে তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবে? সঙ্গীদের চোখের ওপর সে সমুদ্রে ডুবে মারা গেল।

পেনগুইন্ পাখী

এই পাখীগুলোকে বড় অদ্ভুত দেখতে! এদের দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, কতকগুলো মানুষ বসে আছে।
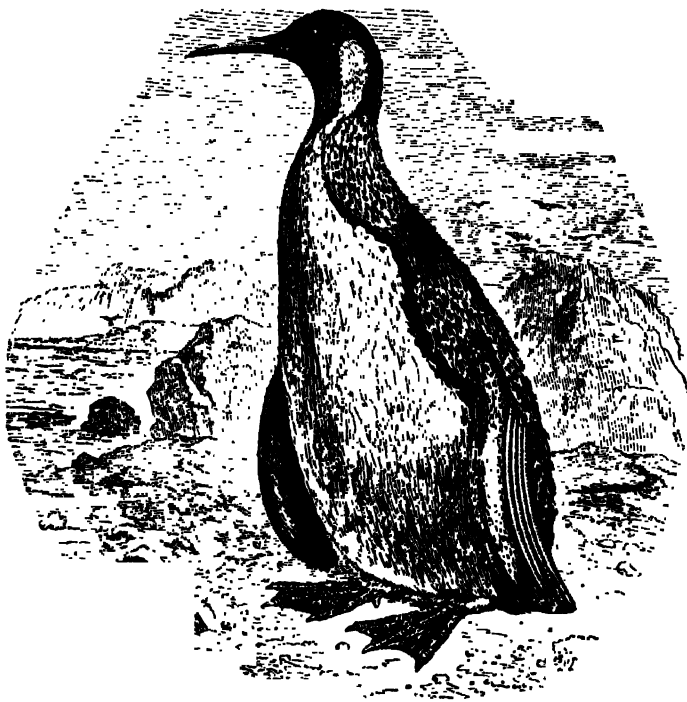
পেনগুইন

পেনগুইনদের পা হাঁসের পায়ের মত জোড়া কিন্তু পা

ডুটি দেহের এত পিছনে থাকে যে, তার ফলে বসে থাক্‌লে সারা দেহটি খাড়া হয়ে থাকে।

এদের ডানা আছে এবং তাতে আঁশের মত ছোট ছোট পালকও আছে। কিন্তু ডানা ডুটি এত ছোট যে, তা' দিয়ে এরা উড়তেই পারে না। এ বিষয়ে এদের সঙ্গে উটপাখীদের বেশ মিল।

পেনগুইনরা উভচর; ডাঙ্গায় ও জলে এরা সমান ভাবে বিচরণ করতে পারে। উটপাখীদের ডানা একেবারেই তাদের কোন কাজে লাগে না, কিন্তু পেনগুইনরা যখন সমুদ্রে সাঁতার দেয়, তখন তাদের ডানা ডুটো সাঁতারে সাহায্য করে। এরা মাছের মত অনায়াসে জলের খুব নীচে পর্য্যন্ত ডুব দিয়ে মাছের পিছনে ধাওয়া করে।

এরা আরও এক কাজে ডানা ডুখানা ব্যবহার করে। যখন খাড়া পাহাড়ের ওপর উঠ্‌তে হয়, তখন এদের ডানা ডুটি সমুখের পায়ের কাজ করে। এই ডানার সহায়তায় যখন এরা উঁচু পাহাড়ে ওঠে, তখন দূর থেকে মনে হয় যেন চার পায়ে চল্‌ছে।

পেনগুইন্‌রা অনায়াসে সমুদ্রে চলাফেরা করতে পারলেও হাঁসের মত এরা সারা শরীর ভাসিয়ে সাঁতার কেটে বেড়ায় না, পানকৌড়ীর মত সমস্ত শরীরটা জলের তলায় ডুবিয়ে কেবল মাথাটি বের করে রাখে।

কখনো কখনো এরা কূল থেকে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রায় হাজার মাইল দূরে চলে যায়।

সমুদ্রের নির্জ্জন দ্বীপে এদের বাস। সাধারণতঃ দক্ষিণ মেরুর কাছে যে একটা নির্জ্জন পার্ব্বত্য দ্বীপ আছে সেখানে পেনগুইনরা বাস করে। এই দ্বীপে পেন্‌গুইন্ ছাড়া আর কিছুই নেই।

এক সময়ে একখানা জাহাজ এই দ্বীপে এসেছিল। নাবিকেরা দ্বীপে নেমে দেখলে, অদ্ভুত রকমের হাজার হাজার পাখী দ্বীপের চারধারে নীরবে বসে রয়েছে। তারা সব বড় বড় বীর, কাজেই এ সব কিছু গ্রাহ্যই করলে না। দ্বীপটা বাস করবার পক্ষে বড় উপযোগী বলে তাদের ধারণা হলো। এদিকে পেনগুইন্‌রা যখন দেখলে, একদল লোক তাদের দ্বীপ কেড়ে নিতে এসেছে, তখন তারা দলে দলে এসে এই নাবিকদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে; আর ভীষণ চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিলে। শুধু কি তাই? তারা দল বেঁধে নাবিকদের ঠোক্‌রাতেও আরম্ভ করে দিলে। ব্যাপার দেখে নাবিকেরা প্রাণের ভয়ে দৌড়।

দক্ষিণ সমুদ্রের অন্যান্য দ্বীপেও এরা বাস করে। এই সকল দ্বীপগুলিকে ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ বলে। এখানে এত লম্বা লম্বা ঘাস হয় যে মানুষ অনায়াসে এর মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। পেনগুইন্‌রা সারা বিকেল বেলাটি এর ওপর শুয়ে থাকে।

এরা খুব পেটুক। সমস্ত সকাল এরা ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে খায়। বিকেল বেলা যদি আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে অর্থাৎ মেঘ বা ঝড় বৃষ্টি না থাকে, তা' হলে এরা এমন ভীষণ চীৎকার করতে থাকে যে—খুব দূর থেকে তা' শোনা যায়।

যখন এদের বাচ্চারা বড় হয়, তখন হঠাৎ একদিন দেখতে পাওয়া যায়, ধাড়ী পেনগুইন্‌রা দ্বীপ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

সারাদিন কেবল খায় বলে পেনগুইন্‌রা ভারী মোটা হয়। পেনগুইন্‌দের মায়েরা বাসা তৈরী করতে জানে না। তারা গর্ত্তের বা বালির ওপরেই ডিম পাড়ে।

আমেরিকার কমাণ্ডার বার্ড তাঁর দক্ষিণ মেরু অভিযানের বর্ণনায় এক জায়গায় পেনগুইনদের বুদ্ধির বিষয় একটি গল্প বলেছেন।

দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ চিরতুষারের দেশ। সেখানে ডাঙায় পেনগুইন, পেট্রেল প্রভৃতি কয়েক রকম পাখী এবং জলে সীল, কয়েক জাতের মাছ ও গ্র্যামপাস্ হোয়েল নামে এক রকম রাক্ষুসে তিমি ছাড়া আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য প্রাণী নেই।

গ্র্যামপাসগুলো ভয়ানক হিংস্র। ওরা সীল, পেনগুইন যা পায় তাই ধরে গিলে খেয়ে ফেলে। সেইজন্য সীল ও পেন্‌গুইনরা গ্র্যাম্‌পাসদের বড় ভয় করে।

পেনগুইনদের খাদ্য মাছ। জলে না নামলে মাছ কোথায়

পাওয়া যাবে ? কিন্তু জলে আবার ঐ রাক্ষসটার ভয়। ওটা পেনগুইনের লোভে জলের নীচে এমন ওত পেতে থাকে যে ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

সেইজন্য পেনগুইনরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই তুষারকূলে দলে দলে বসে সমস্বরে চীৎকার করতে থাকে। যদি কোন গ্র্যামপাস সেখানে থাকে, তাহলে সেই শব্দে তৎক্ষণাৎ ভেসে ওঠে! কিন্তু অনেক সময় এতে কোন ফল পাওয়া যায় না। সেজন্য পেনগুইনরা তাদের কয়েকটিকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়। সেখানে কোন গ্র্যামপাস থাক্‌লে তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড হাঁ মেলে খাড়া হয়ে ভেসে ওঠে। তাই দেখে ওপরের সকলে সাবধান হয়ে যায়, শীঘ্র আর জলে নামে না; আর জলের যারা তারা যদি পালাতে পারে ভালই; না পারলে যা হয়, বুঝতেই পারছ।

অক পাখী

স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে হেব্রাইডিস্ দ্বীপপুঞ্জে সেণ্ট কিল্‌ডা নামে ছোট একটী দ্বীপ আছে।

এই দ্বীপে নানা রকমের পাখীর বাস। সমস্ত দিন রাত পাখীর চীৎকারের সঙ্গে ঢেউএর ও ঝড়ের গর্জ্জন মিশে এক বিচিত্র আওয়াজ এখানে শুনতে পাওয়া যায়।

এই দ্বীপে অক্ নামে এক শ্রেণীর পাখী বাস করে। এরা অনেকটা পেনগুইন্‌দের মত দেখতে বটে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদও আছে। এদের ঠোঁট খুব চওড়া কিন্তু পেনগুইনদের মত সরু নয়। এদেরও ডানা ছোট এবং হাতের মত পাশে থাকে।

অক্ মাতা ডিমের ওপর বসে তা দেয় না। যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়, ততক্ষণ ডিমটা দেহের কাছে ধরে থাকে। যদি কেউ তাড়া করে, এরা ডিম সুদ্ধ জলের মধ্যে পালিয়ে যায়।

অকেরা সমস্তদিন খাবারের চেষ্টায় সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা অনেক খাবার নিয়ে বাসায় ফেরে।

বাচ্চাদের খাবার খাইয়ে খাইয়ে এরা খুব মোটা করে তোলে। এই সেণ্ট কিল্‌ডায় অনেক গল পাখীও বাস করে। সেণ্ট কিল্‌ডায় লোকজনও বাস করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা বড় জোর শ'খানেক, কি, শ'দেড়েক।

এখানে এমন জোর বাতাস দেয় যে অধিবাসীরা ৪ ফুটের বেশী উঁচু বাড়ী তৈরী করতে পারে না। তার বেশী উঁচু হলেই ঝড়ে বাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাই এরা মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে অনেক ঘরও তৈরী করে। এরা ঘরের ছাদে দুই একটা গর্ত্ত রাখে। তাতে জানালার কাজ হয়; কারণ বাতাসের বেগের জন্য পাশে জানালা রাখবার জো নেই।

সেণ্ট কিল্ডার অধিবাসীরা কিছু কিছু ভেড়া পোষে। আশে-পাশে যা' একটু-আধটু ঘাস পায়, পশুগুলো তাই খায়।

সেখানকার লোকেরা রাতে যে আলো জ্বালে সে আলো কেরাসিন বা রেড়ীর তেলের নয়। সেণ্ট কিল্ডায় অনেক পাখী বাস করে, একথা আগেই শুনেছ। এক রকম পাখী এখানে বাস করে, সেই পাখী এদের খাবার জোগায়, আলো দেয় এবং নরম বিছানারও জোগান দেয়। সেণ্ট কিল্ডাবাসীরা যে আলো জ্বালে, সে আলো সেই পাখীর তেলের আলো!

সে পাখী ভিন্ন সেণ্ট কিলডার লোকের চলে না। এই পাখীর নাম—ফাল্‌মরে পাখী।

পাখীগুলো উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় বাস করে।

যখন এদের ধরা হয়, তখন এদের ঠোঁট থেকে একরকম হল্‌দে তেল বেরোয়। এই তেলে বদ্ গন্ধ। যেখানে এরা বাস করে সেখানে এই তেলের ছড়াছড়ি।

এখানকার অধিবাসীর কাছে এই তেল সোনার মত দামী।

গল পাখী

গল পাখীকে সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরে দেখা যায়। এরা সমুদ্রেরই পাখী। ঢেউএর ওপর এদের বাড়ী; কেবল যখন ডিম পাড়তে হয়, তখনই এরা ডাঙায় আসে।

এদের কাজ হচ্ছে দস্যুবৃত্তি। এদের বড় ডানার জন্যে এরা ডুব দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। সুতরাং পরের কাছ থেকে মাছ কেড়ে খায়।

বড় বড় গল পাখীদের বড় বড় সমুদ্র ছাড়া দেখা যায় না। তবে ছোট ছোট গলদের প্রায়ই সমুদ্র তীরে দেখা যায়। এরা যখন সমুদ্রের নীল ঢেউএর ওপরে ঘুরে বেড়ায়, তখন সূর্য্যের আলোয় এদের ডানা দুখানা ঝক্ ঝক্ করে।

এরা যেমন পেটুক তেমনি গোলমেলে; মরা হোক, জ্যান্ত হোক কোন প্রাণীকেই খাবার হিসেবে বাদ দেয় না। কখনো কখনো এরা হেরিঙ্ মাছকে তাড়া করতে করতে নদীতেও এসে পড়ে, আর তাদের ঝাঁককে ঝাঁক সাবাড় করে দেয়। এরা কেবল জলচর প্রাণীই খায় না, ডাঙার পোকা-মাকড়ও ধরে খেয়ে থাকে।

এরা মাছ ধরবার জন্যে ছোঁ মেরে একেবারে জলের মধ্যে পড়ে, কিন্তু সব সময়েই মাছ মুখে নিয়ে উঠতে পারে না।

সবুজ রংএর ঠোঁটওয়ালা গল

যদি ফ্রিগেট্ পাখী কাছাকাছি থাকে, তা' হলে গলদের বড় অসুবিধে হয়। ফ্রিগেটরা চোরের ওপর বাটপাড়িতে ওস্তাদ। ফ্রিগেটরা এদের মুখের মাছটি ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। ফ্রিগেটদের স্বভাব ভারী হিংস্র।

নানা রকমের গল পাখী দেখা যায়। কাল গল, হেরিঙ্ গল, আইস্ল্যাণ্ড গল প্রভৃতি।

আর এক রকম গল আছে, তাদের ঠোঁট সবুজ রংএর।

আর এক শ্রেণীর গল আছে, তাদের স্বর ভীষণ কর্কশ। কখনো কখনো দূর নির্জ্জন তীর ভূমিতে ঝড়ের প্রচণ্ড হুঙ্কারের সঙ্গে গলের কঠোর কণ্ঠস্বর মিশে একটা ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদের সৃষ্টি হয় এবং তা'তে যেন পাহাড়-পর্ব্বত ফেটে পড়ে।

সেণ্ট কিল্ডা দ্বীপ গলদেরও খুব প্রিয় স্থান।

কখনো কখনো আকাশ অন্ধকার করে ঝাঁকে ঝাঁকে গল পাখীকে উড়ে আসতে দেখা যায়।

পাখীদের বাসস্থান

কোন কোন নির্জ্জন দ্বীপ পর্ব্বতময়! দূর থেকে পাহাড়-গুলোকে দেখায় বেশ। মনে হয় যেন পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলো সাগরের নীল জল ভেদ করে আকাশ পানে উঠে দাঁড়িয়েছে! এই সকল পাহাড়ে সামুদ্রিক পাখীর খুব ভীড়। তারা এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে।

সমুদ্রে এক রকম ছোট ছোট পায়রার মত পাখী আছে—এদের নাম পুফিন। পাখীগুলোর ঠোঁট চওড়া ও ত্রিকোণ। এরা ভারী নিরীহ ও বেজায় বোকা। তোমরা ছবিতে

পুফিন্ পাখী

এদের চেহারা দেখলে, এ সত্যটা সহজেই অনুমান করতে পারবে।

পাখীগুলো জলে বেশ সাঁতার কাটতে পারে। দূর থেকে দেখলে অনেক সময় হাঁস বলে ভুল হয়। কিন্তু ডাঙায় আর এদের পা চলে না; চলতে চলতে মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

পাখীদের দ্বীপ

এই সব দ্বীপের অধিবাসী হচ্ছে পাখী। নানা রকমের পাখী দলে দলে এখানে বাস করে।
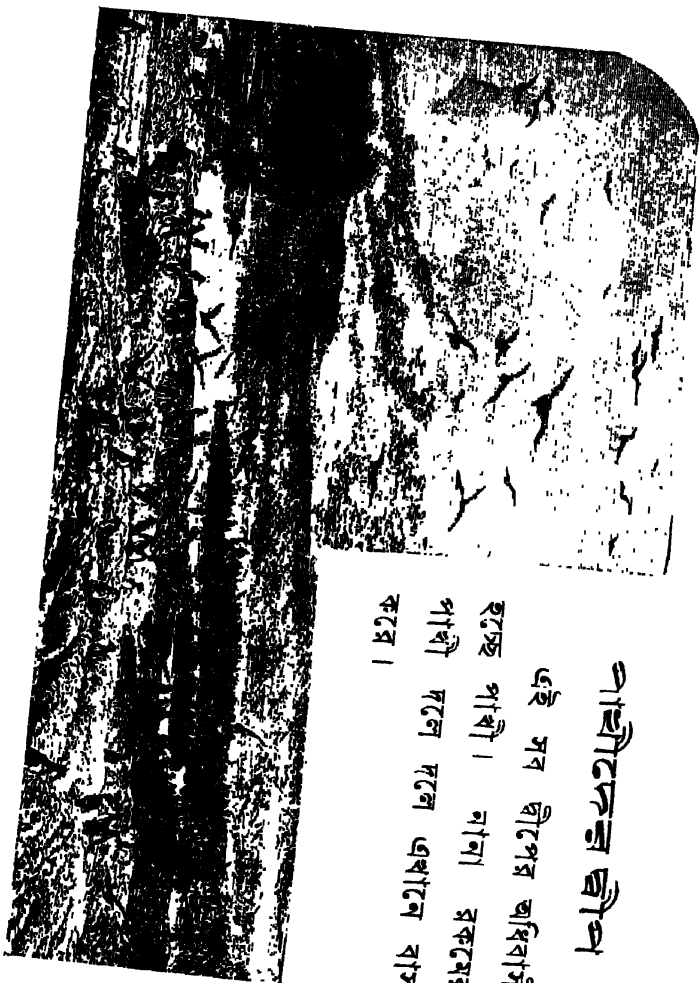
গর্ফু পাখী

এবার এক রকমের পাখীর কথা বলব, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে—গর্ফু। পাখীগুলোর চেহারা ভারী অদ্ভুত। দেখতে অনেকটা পেনগুইনদের মত, কিন্তু মাথায় মুরগীর মত একটি ঝুঁটি আছে।

পাখীগুলো বেশ ভদ্র ও সভ্য। এরা বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করে।

গর্ফুদের বড় বড় শহর আছে!—

কথাটা অবিশ্বাসের বা হাসির নয়।

এরা পাহাড়ের চূড়ো কি গাছের ডালে বাস করে না। সমতল জমিতে সকলে মিলে ঘর তৈরী করে এক একটা শহর গড়ে তোলে।

তাই বলে ভেবো না যে এরা যেখানে-সেখানে শহর তৈরী করে। শহরের উপযোগী স্থান অনেক খোঁজাখুঁজির পর নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে।

যেখানে শহর বসবে সে জায়গাটি সমতল হওয়া চাই। তার কোথাও নুড়ি বা পাথর থাকবে না। এমন জায়গা বেছে নিয়ে তারা সেখানে চার কোণা অনেকগুলি ঘর তৈরী করে। এই চৌকো ঘরগুলি ঠিক পাশাপাশি থাকে এবং প্রত্যেক ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরী করে।

এ সব তৈরী হয়ে গেলে, এক একটি গফ্‌ এক একটি ঘর দখল করে বসে।
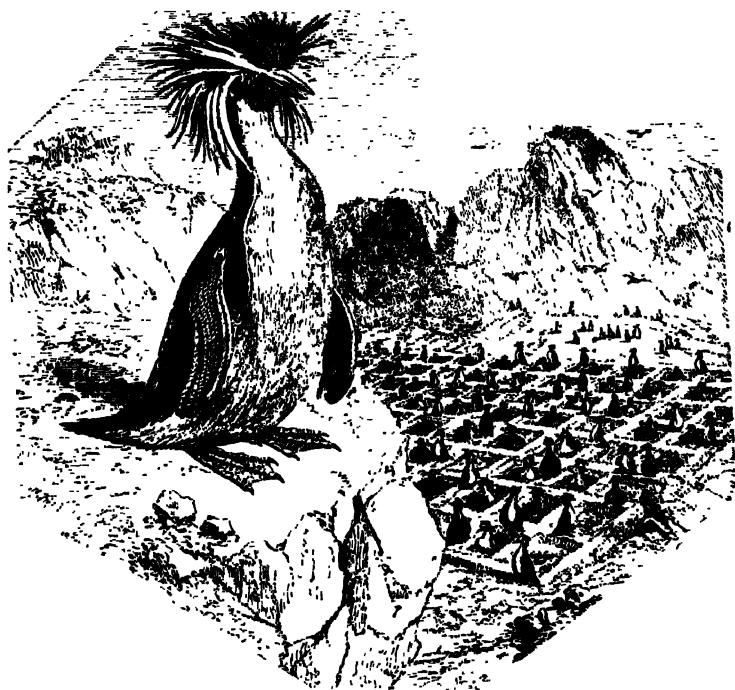
গফ্‌ ও তাদের শহর

উপরের ছবিতে দেখ, এক একটি গফ্‌ পাখী নিজের নিজের ডিমের ওপর বসে আছে।

গফ্‌দের মা নিজের ডিম পেড়ে কোথাও যায় না! কেননা,

বলতে দুঃখ হয়—গফু´রা সভ্য ও ভদ্র হলেও সভ্য মানুষের মত এতটা সৎ হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। সুবিধা পেলে প্রতিবেশী গফু´র প্রতিবেশীর ডিম চুরি করতে বড় বাধে না। তাই অনেক সময় এক একটা গফু´ যত সন্তান পালন করে, তার অর্দ্ধেকও তার নিজের নয়!

গ্রীব পাখী

গ্রীবের পালক রূপোর মত চকচকে, অথচ পশমের মত নরম ও খুব শক্ত।

মেয়েরা প্রায়ই এদের পালক টুপিতে পরে। সাধারণতঃ এদের পালকই এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

হাঁসের সঙ্গে গ্রীবের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু হাঁস থেকে এরা ভিন্ন।

এদের ঠোঁট লম্বা, পা দুটি শরীরের একেবারে পেছনে। ডাঙায় এরা ভাল চলতে পারে না, উল্‌টে পড়ে যায়।

সুতরাং গ্রীবরা জলে ভেসে বেড়াবারই উপযুক্ত। এদের ছোট ডানার জন্য এরা ভাল রকম উড়তেও পারে না। এইজন্য জল ছেড়ে কোথাও বড় যায় না।

জলে মাছ, পোকা-মাকড় এরা এসব খায়। গ্রীবপাখী বাচ্চাকে কাঁধে করে চরিয়ে নিয়ে আসে।

এদের বুকের রূপোলী পালকের জন্য লোকে এদের শিকার করে। কিন্তু এরা এত ভীরু যে, লোক দেখলেই পালিয়ে যায়। এজন্যে এদের শিকার করা ভারী কঠিন।

এরা জলের ওপরে খড়, পাতা ও নাল দিয়ে বাসা তৈরী করে। জলের চেয়ে হাল্কা বলে এগুলো জলের ওপর ভাসে।

গ্রীব পাখী এর ওপর ডিম পাড়ে এবং এখানেই তারা বচ্চাদের পালন করে।

এদের পা দুখানা দাঁড়ের কাজ করে। যখন এরা ভয় পায়

ঝুঁটি-বাধা গ্রীব

বা শত্রুর আক্রমণ বুঝতে পারে তখন পা দিয়ে বাসাটি বেয়ে বেয়ে নদীর অন্যদিকে চলে যায়।

গ্রীবরা জলচর হলেও সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরে বা জলে থাকে না, বড় বড় জলাশয়ই এদের বাসস্থান। তারই জলে বাসা বেঁধে ও তারই জল থেকে খাবার সংগ্রহ করে খেয়ে বেঁচে থাকে।

পেলিক্যান্

এই পৃষ্ঠায় যে পাখীটির ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তার নাম পেলিক্যান
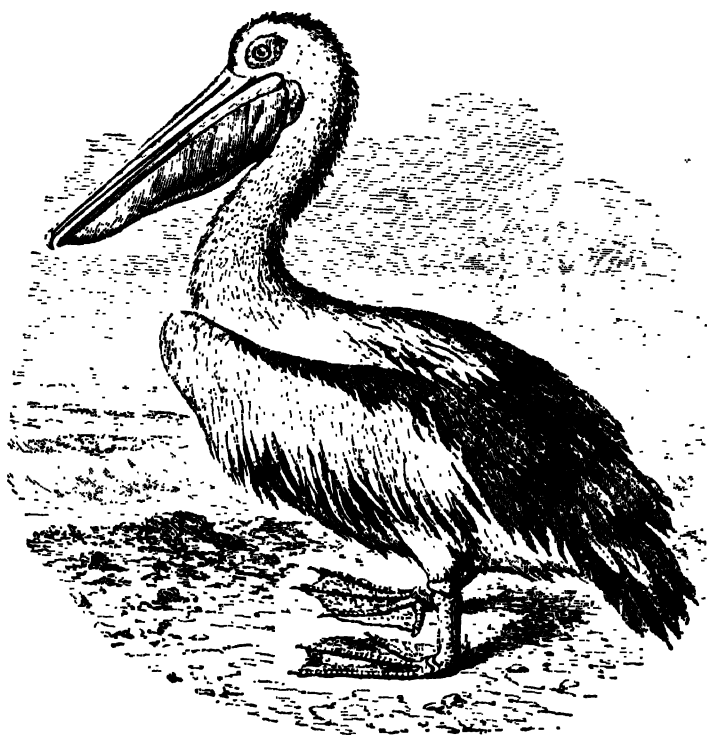
ওর ঠোঁটের নীচে যে লম্বা জিনিষটি রয়েছে, সেটি বেশ

লক্ষ্য করে দেখ। ওটা হচ্ছে একটা থলে; থলেটা পশমের মত নরম একরকম পদার্থে তৈরী।

থলেটিকে এরা ইচ্ছামত বাড়াতে, কমাতে ও ফোলাতে পারে। পেলিক্যানরা মাছ খায়। ওই থলের মধ্যে অনেক মাছ ধরে। মাছ ধরবার সময় পেলিক্যানদের থলেটি খুব কাজে লাগে।

এরা মাছ ধরে' থলেটির মধ্যে জমা করে রাখে এবং বাচ্চাদের জন্যে বাসায় নিয়ে যায়; নয়তো ইচ্ছামত খায়। থলেটি খালি হলে গুটিয়ে গিয়ে খুব ছোট্ট হয়ে যায়।

পেলিক্যানরা বড় মজা করে থলে থেকে মাছ বার করে। যখন মাছ বার করবার দরকার হয়, তখন ওপর দিককার ঠোঁট ঘাড়ের দিকে, কখনো বা বুকের দিকে নিয়ে এসে চাপ দেয় এবং তাতে থলে থেকে মাছগুলো বেরিয়ে পড়ে।

পেলিক্যানরা ভাল সাঁতার দিতে পারে বটে, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর যেতে সাহস করে না। এরা দলে দলে সমুদ্রতীরে বাস করে।

কখনো কখনো আকাশে দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়—এবং শিকার দেখলেই তার উপর এসে পড়ে। তখন এদের ডানার আঘাতে জল তোলপাড় হতে থাকে, আর মাছগুলো ভয় পেয়ে পালাবার পথ পায় না।

পাখীগুলোর বেশ বুদ্ধি আছে, এরা আর এক রকম উপায়ে

মাছ ধরে। জেলেরা যেমন জাল টেনে মাছ ডাঙার দিকে নিয়ে

লহ ংকর

আসে, এরাও তেমনি জলে নেমে গোল হয়ে ডাঙার দিকে মাছ তাড়িয়ে নিয়ে আসে এবং ডাঙার কাছে এনেই তাদের

ধরতে আরম্ভ করে। একটি মাছও তখন আর পালাতে পারে না।

প্রথমে এরা থলেটি মাছে ভর্ত্তি করে এবং তারপর যত পারে খেতে আরম্ভ করে। এই থলের মধ্যে মাছ শীগ্‌গির খারাপ হয় না।

চীনেম্যানরা পেলিক্যানদের চেয়েও চালাক। মাছ ধরবার জন্যে তারা পেলিক্যান পোষে। মাছ ধরবার দরকার হলে তারা কতকগুলো পেলিক্যানের পায়ে দড়ি বেঁধে জলে ছেড়ে দেয়। পেলিক্যানরা মাছ ধরে থলেয় পোরে, দু'একটা খায়ও। থলেটা ভর্ত্তি হলে পাখীগুলো ডাঙায় ফিরে আসে। তখন চীনেরা সেই মাছ বার করে নিয়ে হয় নিজেরা খায়, নয় ব্যবসা করে।

এক থলে মাছ ছ'জন লোকের পক্ষে যথেষ্ট।

পেলিক্যানদের মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

পেলিক্যানমাতা অনেক সময় তার সন্তানকে এমন শাসন করে যে, তার ঠেলায় শিশুটি প্রায় পঞ্চত্ব পাবার মত হয়। পাখীদের মধ্যে আইন-আদালত না থাকলেও শিশুটির অবস্থা দেখে নিজেদের নিষ্ঠুরতায় মা নিজেই বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, তার মনে অনুতাপ জাগে। তখন সে ঠোঁট দিয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত বার করে সন্তানটির সারা গায়ে ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু

রক্তমোক্ষণের ফলে মা ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। সন্তানেরা তখন বাধ্য হয়ে বাসা ছেড়ে মা ও তাদের জন্যে খাবারের সন্ধানে বার হয়। সন্তানদের মধ্যে কেউ যদি এতে অবহেলা করে তাহলে মা সুস্থ হয়ে সেই সন্তানটিকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যারা মাতৃভক্ত তাদের নিয়ে বাস করে। গল্পটি বিশ্বাস করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছা।

সমুদ্রের ঈগল

মৎস্য-শ্যেন নামে এক ভীষণ শিকারী পাখী সমুদ্রে বাস করে। অন্যান্য পাখীর মত এরাও মাছের উপর ছোঁ দিয়ে পড়ে।

এরা প্রথমে আকাশে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে—তারপর খানিকক্ষণ আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়, সেই সময় নীচে সমুদ্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখে। শেষে হঠাৎ উল্কা বেগে মাছের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু নীচে থেকে দেখা যায়, পাখীগুলো আপন মনে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল উল্কাবেগে সমুদ্রের জলের ওপর এসে পড়ল, পড়েই আবার উঠ্‌ল।

তারপরই দেখা যায়—ঐ যে মাথার পালক থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ছে, মুখে একটি জ্যান্ত মাছ—ধড়ফড় করছে।

কিন্তু জল থেকে মুখে করে আনলেই যে সব সময়ে এরা মাছটি খেতে পায়, তা মনে করো না।

এদের শত্রু হচ্ছে সমুদ্রের ঈগল।

ঈগল নির্জ্জন তীরভূমি ভালবাসে, আর ভালবাসে নির্জ্জন উঁচু পাহাড়। কোন গাছের ডালে বা পাহাড়ে বসে ঈগল লক্ষ্য রাখে মৎস্য-শ্যেন কি করছে।

ঈগল পাখী মৎস্য-শ্যেনকে আক্রমণ করেছে

যখন দেখে মৎস্য-শ্যেনের ঠোঁটে মাছ তখন সে ডানা বিস্তার করে সাদা মাথাটি নীচু করে উল্কাবেগে মৎস্য-সেনের ওপর গিয়ে পড়ে।

মৎস্য-শ্যেন ভয় পেয়ে মাছটি ছেড়ে দেয়। মুহূর্তমধ্যে ঈগল ছোঁ মেরে মাছটি মুখে নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যায়।

মাছই সমুদ্র-ঈগলের সাধারণতঃ প্রধান খাদ্য। এদের শক্তি ও সাহসের তুলনা নেই। ঈগলকে বলা হয় পাখীর রাজা।

সমুদ্র তীরে যারা বাস করে, তারা সমুদ্র ঈগলকে ভয় করে চলে। এরা ভেড়ার পাল থেকে কখন কখন ভেড়ার খুব ছোট ছোট বাচ্চাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ারও এদের কবল থেকে রক্ষা পায় না। এরা কখনো কখনো গরুর পালকেও বিশেষ করে বাছুরকে আক্রমণ করে।

এরা যে কি ভাবে জন্তুর পালকে আক্রমণ করে, তা' না দেখলে বোঝা যায় না।

প্রথমে এরা তীরবেগে এসে সমুদ্রে পড়ে, তাতে সারা শরীর ভিজে যায়। তারপর সমুদ্রের তীরে বালিতে ওলোট-পালট খেয়ে সারা দেহটি বালিতে মাখিয়ে নেয়।

তারপর আবার আকাশে উড়ে যায় এবং সেখানে ঘুরতে ঘুরতে নীচে যদি কোন গরু বা ষাঁড় দেখতে পায়, তাহলে তার মাথার ওপর এসে ঘুরতে থাকে।

হয়তো গরুটি শান্তশিষ্ট ভাবে চরচে এমন সময় ওপর থেকে বৃষ্টির মত এক পশলা বালি তার চোখের ওপর এসে পড়লো। ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে ঈগল এমনি ভাবে আরও বালি ফেলতে থাকে। বেচারী গরুটি অন্ধ হয়ে যায়, তখন নখ, ডানা, আর ঠোঁট দিয়ে ঈগল তাকে ঠোক্কোর মারতে থাকে।

গরুটী ভয় পেয়ে চারিদিকে ছুটতে থাকে—চোখে দেখতে পায় না, হয়তো জলেই গিয়ে পড়ে; কিম্বা ছুটাছুটি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন সমুদ্র-ঈগল তাকে মেরে খেয়ে ফেলে

এরা এভাবে সমুদ্রের ডলফিন্‌ও শিকার করে। কিন্তু এক এক সময়ে ডলফিনের গায়ে এদের নখ এমনি ভাবে ফুটে যায় তা টেনে বার করতে পারে না। ডলফিন্‌রা প্রাণের ভয়ে সমুদ্রের তলদেশে পালাতে থাকে আর তাতে করে ঈগল ডুবে মারা যায়।

ঈগলের হিংস্রতার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। কিন্তু সবগুলোই যে সত্যি তা মনে কোরো না। বিশেষ করে ওদের বড় বড় জন্তু শিকার-ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত। আমাদের বাঙলাদেশে ঈগল নেই। যা আমরা শুনি, সবই অন্য দেশের গল্প। গল্পের মধ্যে অতিরঞ্জনের দরুণ সত্যের ভাগটা অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। তবে এটা সত্য যে ঈগল খুব হিংস্র এবং ছোট ছোট প্রাণী, এমন কি, ছোট ছেলেমেয়েদেরও সুবিধা পেলে আক্রমণ করে।

সমুদ্রের অন্যান্য জীবজন্তু

মেরু প্রদেশের ভাল্লুক

উত্তর মেরু প্রদেশে এক শ্রেণীর ভল্লুক বাস করে। তাদের বাসা হচ্ছে চাঙ্গড় বাঁধা বরফের সমুদ্রের ওপর অথবা তুষার পর্ব্বতের গুহা।

উত্তর মেরুতে এত শীত যে, সমুদ্র সেখানে জমাট হয়ে এক এক স্থানে বরফের চাঙ্গড় তৈরী করেছে। সেগুলো কখনো গলে না।

মেরু প্রদেশের ভাল্লুককে শ্বেত ভাল্লুক বা মেরু-ভাল্লুক বলা হয়।

এদের খাদ্য সমুদ্রের শীল ও মাছ। এরা খাবারের সন্ধানে বরফের ওপর ঘুরে বেড়ায়।

কখনো কখনো এরা বরফের চাঙ্গড়ে চড়ে বসে। সেই চাঙ্গড় ভাসতে ভাসতে দক্ষিণে আইস্‌ল্যাণ্ড্ বা নরওয়েতে এসে ঠেকে।

সেখানকার লোকেরা ভাল্লুকের মত ভদ্র অতিথিকে পছন্দ করে না। বর্শা, বন্দুক ও লাঠি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে।

রু প্র ভাল্লুক

অবশ্য ভাল্লুকেরা এমন দুঃসাহস সচরাচর করে না, নিতান্ত না খেতে পেলে কখনো কখনো এমন করে। এরা যেমন কঠিন বরফের ওপর স্বচ্ছন্দ ভাবে চলা-ফেরা করতে পারে, জলেও তেমন সাঁতার কাটতে পটু।

এদের পায়ের আঙ্গুলগুলো জোড়া বলে সাঁতার কাটতে একটুও কষ্ট হয় না। এদের পায়ের নীচের দিকটাও পাতলা ও নরম চামড়ায় জোড়া সেজন্য বরফের ওপরও এরা দৌড়াতে পারে।

এরা যেন জলের পোকা। জলে নানা রকম কসরৎ করে সাঁতার কাটে। কখনও কখনও জলের ওপর চীৎ হয়ে ভাসে। সে সময় সামনের থাবা দুখানা দিয়ে পিছনের পা দুখানা চেপে ধরে; কেবল তাই নয়, সেই অবস্থায় পিপের মত জলের ওপর ঘুরপাক দেয়। এরা সময় সময় সত্তর আশি মাইল স্বচ্ছন্দে সাঁতরে পার হয়ে যায়।

এত গেল সাঁতারের কথা; জলে ডুব দিতেও এরা পরম পটু। সাঁতরে ও ডুব দিয়ে এরা শীল বা মাছ ধরে।

এরা বরফের উপর এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে, একেবারে কাছে না গেলে এদের দেখতে পাওয়া যায় না।

এদের গায়ের লোম ঈষৎ হলদে ও সাদায় মেশান। এই জন্যে দূর থেকে বরফ কি ভালুকের গায়ের লোম এ চেনবার জো থাকে না।

এরা বরফের ওপর দিয়ে এমন নিঃশব্দে চলে যে একেবারে ঘাড়ের ওপর না এসে পড়লে, টের পাওয়া যায় না।

শিকারী ও ভাল্লুক

বহুকাল আগে একদল নাবিক উত্তর মেরু প্রদেশে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যায়। তাদের একজন জাহাজ থেকে নেমে বরফের ওপর বসে বিশ্রাম করছে; পাশে গুলিভরা

রাইফেল। সে ঠিক করে আছে যে সাম্‌নে কোন ভাল্লুক দেখ্‌তে পেলেই তাকে গুলী করবে। এদিকে তার পিছনে যে কৃতান্ত এগিয়ে আস্‌চে, তা সে জান্‌তেও পারলে না। যখন জান্‌তে পারলে, তখন তার মাথাটা শ্বেত ভাল্লুকটার মুখের মধ্যে। কিন্তু জেনেও তার কোন সুবিধা হল না। ভাল্লুকটা নিমেষে তার মাথাটা চিবিয়ে গুঁড়িয়ে ফেল্‌লে।

রেনডিয়ার (মেরু প্রদেশের হরিণ), বেগুনে শিয়াল (এরা গ্রীষ্মকালে মেরু প্রদেশে আসে) প্রভৃতি স্থলচর, আর শীল ও ওয়ালরাশ্‌ প্রভৃতি জলচর জন্তু শ্বেত ভাল্লুকের খাদ্য।

মেরু-ভাল্লুকের সম্বন্ধে নানা গল্প আছে ; সেগুলোর সমস্তই যে সত্য তা নয় !

পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ একজন শিকারী মাটিতে পড়ে রয়েছে—যেন মরে গেছে। কিন্তু লোকটা সত্যই মরে নি ; মরার ভান করে পড়ে আছে।

ভাল্লুক যদি দেখে তার শিকার মরে গেছে, তা' হলে তাকে সময় মত খাবে বলে ফেলে রেখে দূরে চলে যায়।

শিকারীটি লক্ষ্য করচে কখন ভাল্লুকটি চলে যাবে। যখন বুঝবে ভালুকটি বেশ দূরে চলে গেছে, তখন তীর দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে। ভাল্লুকের কবল থেকে শিকারীদের বাঁচবার এই একটি উপায়।

শ্বেত-ভাল্লুকদের গায়ে খুব জোর। তারা দশ-এগারো

হাত লম্বা তিমি মাছকে স্বচ্ছন্দে ডাঙায় তুল্‌তে পারে—অবশ্য মরা তিমিকে।

শ্বেত-ভাল্লুকরা ডাঙায় যখন শিকার ধরে, তখন শিকারের দিকে সোজা যায় না, এঁকে-বেঁকে চলে। কিছুতেই তাকে বুঝতে দেয় না যে সে তার লক্ষ্য। সে চলে আর থম্‌কে দাঁড়ায়। কখনও কখনও বরফের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলে।

যারা শ্বেতভাল্লুক শিকার করে, তারাও তার দিকে লক্ষ্য রেখে চুপ করে বসে থাকে। ভাল্লুকটা তাতে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যায়। শেষে শিকার ও শিকারীর মাঝে ব্যবধান হয়ত থাকে মাত্র চার-পাঁচ হাত, শিকারীরা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভাল্লুকটিকে বল্লম দিয়ে শেষ করে ফেলে। এইটুকু ব্যবধান থেকে বন্দুকের চেয়ে বল্লম দিয়ে শিকার করাই নিরাপদের।

ভাল্লুকেরা সারা বছর বরফের ওপর থাকে।

কিন্তু ভাল্লুকের মায়েরা তা' পারে না। যখন তাদের সন্তান প্রসবের সময় আসে, তখন তারা কোন পাহাড়ের কাছে চলে যায় এবং সেখানে পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর গর্ত্ত খোঁড়ে। এই গর্ত্তে ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্ম হয়।

গর্ত্তটি বেশী বড় করে না; এমন ভাবে গর্ত্ত খোঁড়ে যাতে কেবল মা ও তার বাচ্চাদের ধরে। গর্ত্তটির মধ্যে মা ও বাচ্চাদের মাথার ওপর দিয়ে শীত চলে যায়। বাচ্চারা যত

বড় হয়, তাদের গায়ের গরমে বরফ গলে গিয়ে গর্ত্ত ক্রমেই বড় হতে থাকে। যখন বসন্ত কাল আসে, মা গর্ত্ত থেকে এদের বের করে নিয়ে আসে। তখন বাচ্চারা স্বাধীন হয়।

শীতকালে মা কিছুই খায় না। বড় আশ্চর্য্যের মত শোনাচ্ছে—না?

সত্যি তাই। শরৎকালে ভাল্লুক-মাতা চর্ব্বির খাবার পেট পূরে খায় এবং তারই ফলে সে হয়ে ওঠে খুব মোটা। তারই জোরে বরফের গুহায় মাসের পর মাস সে অনাহারে কাটাতে পারে।

অবশ্য সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন খুব রোগা হয়ে যায়, আর খিদেয় পাগলের মত হয়ে থাকে। সেই সময় যদি কেউ সমুখে পড়ে, তবে তার আর নিস্তার নেই।

শ্বেতভাল্লুক-মাতা নিজের সন্তানদের বড় ভালবাসে। যদি কেউ বাচ্চাদের মারে, তা' হলে সে ক্ষেপে ওঠে। যে তার বাচ্চাদের মেরে ফেলে, তাকে যে কোন উপায়েই হোক সে মেরে ফেলে, আর দিনরাত বাচ্চাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

সীল মাছ

সীলও পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রে বাস করে।

মেরুপ্রদেশে খাদ্যের বড় অভাব; সেজন্য সেখানকার অধিবাসীরা প্রায় পেট ভরে খেতে পায় না। অবশ্য উত্তর মেরুপ্রদেশেই মানুষ আছে। তাদের কাছে সীল খুব মূল্যবান্ প্রাণী।

সীল তাদের খাবার দেয়, আলোও দেয়। উত্তর মেরুর কাছে যারা বাস করে, তাদের এস্কিমো বলে। এস্কিমোদের বরফের ঘরে শীতের অফুরন্ত রাতে যে আলো জ্বলে,—তা' তারা এদের কাছে থেকেই পায়। সে আলোক সাধারণতঃ সীলের চর্ব্বির। এই আলোয় তারা দুরন্ত শীতে উত্তাপও পায়, তা' যত সামান্যই হোক্ না।

যদি এক সপ্তাহ মধ্যে সীল ধরা না পড়ে, তা'হলে এদের যেন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়—আমাদের দেশে যেমন হয়, এক বৎসর ধান না হলে।

হয়তো একদিন সকালে হঠাৎ সমুদ্রতীরে খুব সোরগোল পড়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা হৈ হৈ করে দেখতে ছুটল ব্যাপারটা কি। গিয়ে দেখ্‌লে অনেকে মিলে বরফের ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড সীল মাছ টেনে নিয়ে আস্‌ছে। তখন

কি আনন্দ! এই বৃহৎ জন্তুটি তাদের ভাঁড়ার খাদ্যে পূর্ণ করে দেবে। শুকনো খট্‌খটে পিদ্দিম তেলে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। সারা দিনরাত তখন এদের আমোদ চলে।

সীলমাছের ডানার মত চারটে পা আছে। সমুখে দুটো, আর পেছনে দুটো। পেছনের পা দুটো চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই পা দুটি কেবল পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্নই নয়—লেজের সঙ্গেও জোড়া। সুতরাং এই তিনটেয় মিলে সাঁতার কাটবার সময় মস্ত বড় ডানার মত হয়।

সুমুখের পা দুটিও চামড়ায় মোড়া। এ পাদুটিতে নখ আছে; ছোট ছোট আঙ্গুলের অংশও দেখতে পাওয়া যায়।

ডানার মত পা নিয়ে সীলদের ডাঙায় চরা খুব অসুবিধে হয়। জলেও অবশ্য এরা খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে না। সীলকে মাছ বল্‌ছি বলে মনে কোরো না, সীল মাছ জাতীয় প্রাণী। এরা স্তন্যপায়ী ও মেরুদণ্ডী। কোন এক সুদূর অতীতে ডাঙায় চরে বেড়াত; কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে জলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তারপর থেকে জলেই বাস করে আস্‌ছে। সেইজন্য এখনও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এদের জলের ওপর উঠতে হয়, এমন কি খাবারের সন্ধানেও এরা ডাঙায় ওঠে।

এরা বরফের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে। এই সব কারণে এরা মানুষ ও ভাল্লুকের কবলে প্রাণ হারায়।

এরা কখন ডাঙায় আসবে, তা' দেখবার জন্য লোমের পোষাক-পরা মানুষ লুকিয়ে থাকে। তার হাতে থাকে খুব ধারাল বর্শা। যখন শীল বরফ খুঁড়তে আরম্ভ করে, ঠিক সেই সময় ধারাল বর্শাটি তার পিঠের ওপর সজোরে এসে পড়ে।

মানুষটি শীল শিকার করছে

সীলদের কান দুটি বড় সজাগ। একটু সামান্য শব্দও এরা শুনতে পায়। সেই জন্য শিকারীকে কাজ সারতে হয় চোরের মত নিঃশব্দে।

মানুষ ভিন্ন সীলের আর এক শত্রু আছে—সে হচ্চে নেকড়ে বাঘ। এরাও শিকারীর মত সীলের গর্ত্তের কাছে

ভাল্লুক সীল ধরেছে

ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সীল যদি গর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই—নেকড়ের পেটের ভেতর যাবার পর হয়তো তার ঘুম ভাঙে !

সীলের মত আরো কয়েকটি জন্তু সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ডাগং, হাতী সীল, লোমশ সীল বা ওটারি ও সমুদ্র সিংহ অন্যতম।

ডাগঙের মাথাটি গোল, দূর থেকে মনে হয় যেন স্ত্রীলোকের মাথা। এইজন্যে আগে নাবিকেরা ও পথিকেরা ভাবতো ডাগঙের অর্দ্ধশরীর স্ত্রীলোকের মত আর অর্দ্ধেক মাছের মত। এই থেকে ইউরোপে মারমেড্ ও মারমেন্ সম্বন্ধে বহু গল্প ও কবিতা রচনা হয়েছে।

ডাগং হচ্ছে সীল ও তিমির মাঝামাঝি। এরা লম্বায় প্রায় ২০ ফিট হয়। এদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল বেরোয়। কিন্তু এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

হাতী সীলের শরীর হাতীর মতই প্রকাণ্ড। সাধারণতঃ দক্ষিণ মেরুর বরফ-সমুদ্রে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

এদের চামড়া ও তেলের জন্য শিকারীরা বড় বড় জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করে। কিন্তু হাতী সীল এত ঠাণ্ডা প্রকৃতির যে শিকারীরা মারতে এলেও পালাবার বিশেষ চেষ্টা করে না।

কিন্তু যদি কেউ এদের মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা চুরি

করে নিয়ে যায়, তখন এরা তার পেছন পেছন ধাওয়া করে এবং সুবিধা পেলে তাকে দাঁত দিয়ে দু টুকরো করে ফেলে।

লোমশ সীল

হাতী সীলরা এত মোটা যে ডাঙায় ভাল চলতেই পারে না। এজন্য এরা ডাঙায় বড় আসতে চায় না। যদি রোদের

খুব তেজ হয় তাহলে ডাঙায় গড়াগড়ি খেয়ে বালি মেখে পড়ে থাকে। এরা রোদ্দুর একেবারে সহ্য করতে পারে না।

এদের চামড়ায় একেবারে লোম নেই ; আর তেলে একটুও দুর্গন্ধ নেই। সেজন্য এর তেল নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্র সিংহ

যে সীলের চামড়ার পোষাক হয়, তারা লোমশ। লোমশ সীলেরা দক্ষিণ সেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। এদের সারা দেহ লম্বা লম্বা লোমে ভর্ত্তি! এই লোমের তলায় আবার খুব

নরম পশম আছে। এই পশম এত দামী যে, শুধু এর জন্যেই সীলদের প্রাণ দিতে হয়।

সেটল্যাণ্ড দ্বীপে যখন প্রথম মানুষ যেতে আরম্ভ করে তখন এই সব সীলেরা ঠিক পোষা জন্তুর মত ব্যবহার করতো। তারা মানুষের পথ থেকে মোটেই সরে যেতো না। কিন্তু যখন দেখলে, তাদের বন্ধু-বান্ধব মানুষের হাতে প্রাণ দিচ্ছে, তখন থেকে তাদের মাথায় একটু একটু করে বুদ্ধি গজাল। মানুষ দেখলেই তারা সমুদ্রের কূলে বড় বড় গাছে বা পাহাড়ের ওপর উঠে পড়ত, যেখানে থেকে সমুদ্রে অনায়াসে ঝাঁপ দেওয়া যায়।

শিকারীরা এই লোমশ সীল শিকার করে করে এদের বংশকে খুব কমিয়ে এনেছে। কিছুকাল পরে হয়তো এরা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে।

সীলদের এক জাতি আছে, তাদের বলা হয়, সী-লায়ন বা সমুদ্র-সিংহ। সমুদ্র-সিংহ ঠিক সিংহের মত দেখতে। এদের মুখখানা সিংহের মত, তাতে গোঁফ আছে এবং ঘাড়ে লম্বা কেশর থাকে।

এদের দক্ষিণ ও উত্তর উভয় সমুদ্রেই দেখা যায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং অন্যান্য সীলের মতই অত্যন্ত নিরীহ।

ওয়ালরাস্

ওয়ালরাস্‌ও সীলের জাতি। এদেরও শরীর প্রকাণ্ড, মুখের দুপাশে বা সামনে দুটি লম্বা দাঁত, তার আগা ছুঁচলো—এই সব নিয়ে চেহারাটা দেখতে ভারী কদাকার।

কদাকার হলেও এদের দাঁত দুটি কিন্তু কাজে লাগে। এর সাহায্যে এরা মাটি খুঁড়ে শেল মাছ বা গাছের শিকড় খায়;

ওয়াল্‌রাস্‌কে নেক্‌ড়ে ধরেছে

আবার পাহাড়ে ওঠবার সময় এর সাহায্যে বৃহৎ শরীরকে টেনে ওপরে তুলতে পারে।

দাঁত দুটি যে কেবল ঐ দুটি কাজেই লাগে, তা নয়। এরা

রাস

অস্ত্র হিসেবে তা কখনও কখনও ব্যবহার করে থাকে। এর সাহায্যে এরা শত্রু নেকড়ে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধও করতে পারে। কিন্তু এমন অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও নেকড়ে বাঘ এদের কাবু করে ফেলে।

এদের দাঁত মানুষের কাছে খুব দামী। এদের বৃহৎ শরীর ও ভীষণ দাঁত সত্ত্বেও এরা মানুষের বশ হয়।

যখন মানুষের বশ হয়, তখন এরা মনিবকে খুব ভাল বাসে। একজন রাসিয়ান স্ত্রীলোক একটি ওয়ালরাস্ পুষে ছিলেন—সে তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোতো।

ওয়ালরাসরা এক এক জায়গায় দল বেঁধে বাস করে। এদের বাসস্থান উত্তর মেরু-প্রদেশ। এ অঞ্চল ছাড়া এদের আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ওয়ালরাসরা বড় নিরীহ প্রাণী। এদের হিংস্রতার সম্বন্ধে যে সব গল্প আছে তা সত্য নয়।

তিমি

তিমি ভারী অদ্ভুত জন্তু। এরা না মাছ, না স্থলচর। কিন্তু পণ্ডিতরা অনুমান করেন, তিমিরা এক আদিম যুগে স্থলচর প্রাণী ছিল। এরা স্তন্যপায়ী।
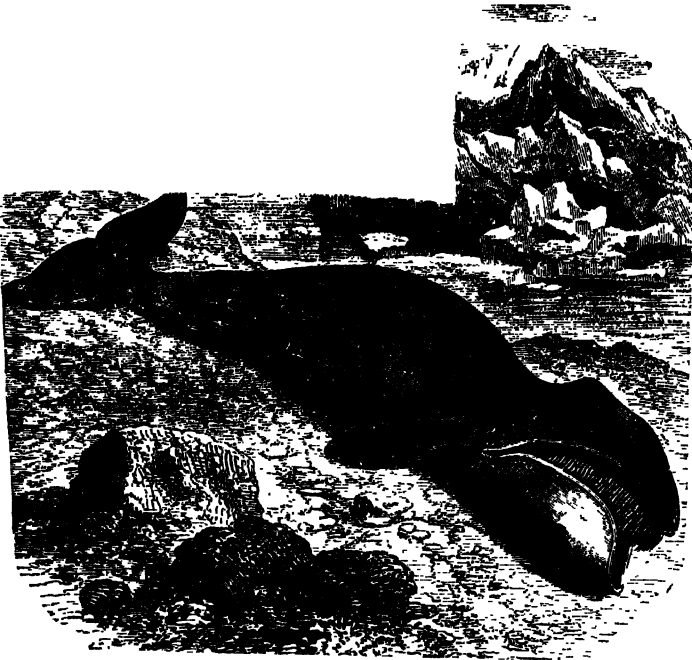
এদের বাস উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রে। আর্কটিক সাগরে এদের প্রায়ই দেখা যায়;

যেখানে সমুদ্র বরফে পরিণত হয়েছে, সেখানেও এরা বিচরণ করে।

তিমির তেল ও চোয়ালের হাড় নানা কাজে লাগে বলে বড় দামী। তিমির চামড়াও অনেক কাজে লাগে। সেইজন্য নানা দেশের লোকেরা তিমি শিকার করতে যায়।

তিমি মাছ নয়; মাছের মত এদের ঝিল্লি নেই, সেই জন্য নিঃশ্বাস নিতে এরা মাঝে মাঝে জলের ওপরে ভেসে ওঠে।

এদের শরীরের অসংখ্য শিরার ভেতর খানিকটা রক্ত থাকে, যা' এদের নিঃশ্বাস নেওয়ার কাজে লাগে।

যখন এরা জলের নীচে থাকে, তখন অক্সিজেন কোথায় পাবে? তখন এরা এই বাড়তি অক্সিজেন পূর্ণ রক্তের সাহায্য নেয়। তাতে করে খানিকক্ষণ এদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হয়। এই রক্তস্রোত এদের বুকের মধ্যে, পাঁজরার মধ্যে ও হাড়ের মধ্যে, এমন কি মাথার মধ্যেও প্রবাহিত হয়।

যখন এরা জলের ওপরে উঠতে বাধ্য হয়, তখন আবার যে নতুন অক্সিজেন পায়, তার খানিকটা শরীরের মধ্যে চলে যায়, খানিকটা পুনরায় ব্যবহারের জন্যে বাড়তি রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে।

অদ্ভুত নয় কি? আরও অদ্ভুত, যখন এরা নিশ্বাস নেবার সময় মাথার কাছে একটি সরু নল দিয়ে ফোয়ারার মত জল ছাড়ে।

শিকারীরা যখন বর্শা দিয়ে তিমিকে আঘাত করে, তখন ভয়ে এরা এত জোরে সমুদ্রের তলদেশে ডুব মারে যে, অনেক সময় সমুদ্রের তলায় পাহাড়ে লেগে এদের মাথা ভেঙ্গে যায়।

তিমি তো বরফের সমুদ্রে বাস করে, তবে কি করে এরা তাদের শরীর গরম রাখে?

বর্শাবিদ্ধ তিমি প্রাণপণে ডুব মারছে

এদের দেহের চামড়া খুব পুরু, তার নীচে আবার ঘন তেলের স্তর। কাজেই, এদের শরীরের মধ্যে ঠাণ্ডা ঢুকতে পারে না।

এই তেল এদের দুটি বিষয়ে সাহায্য করে। প্রথমতঃ তা' শরীরকে গরম রাখে; দ্বিতীয়তঃ জলের চেয়ে তেল হাল্কা। সেইজন্য অত বড় শরীরটা স্বচ্ছন্দে জলের ওপর ভেসে থাকে।

এদের শরীর প্রকাণ্ড হলেও এরা ভারী নিরীহ। এদের খাদ্য বড় বড় জন্তু নয়, ছোট ছোট জেলি মাছ।

এরা যখন হাঁ করে, জলশুদ্ধ এক গাদা জেলি মাছ এদের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে এদের চোয়াল বন্ধ হয়ে যায়। এদের ওপরকার চোয়ালে সারি সারি কাঁটা সাজান আছে। চোয়াল বন্ধ হলে এই কাঁটার ভেতর দিয়ে সেইজল অনায়াসে বেরিয়ে আসে, কিন্তু মাছ আর বেরুতে পারে না। মুখের মধ্যেই থেকে যায় এবং সেখান থেকে তারা চলে যায় পেটে।

তিমি এত নিরীহ কিন্তু তিমির শত্রুর মোটেই অভাব নেই। স্থলে মানুষ ছাড়াও জলে যে সব শত্রু অনবরত এদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে—তাদের মধ্যে তরোয়াল মাছ ও হাঙ্গরই প্রধান।

তরোয়াল মাছের প্রধান আনন্দ হচ্ছে, তাদের তরোয়াল দিয়ে তিমিকে বেঁধা।

হাঙ্গর তিমি মাছের অর্দ্ধেক শরীরের মত লম্বা লেজ দিয়ে ধপাধপ তিমিকে মারে। দূর থেকে তার শব্দ ঠিক বন্দুকের শব্দের মত মনে হয়।

এসব জন্তুদের আক্রমণ থেকে বেচারী তিমি কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে না—তার প্রকাণ্ড শরীর তার কোন কাজেই আসে না।

যখন তরোয়াল মাছ তিমিকে তরোয়াল দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে তখন তার রক্তে সমুদ্র লাল হয়ে ওঠে।

তিমি শিকার খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু প্রচুর লাভের আশায় লোকে সে বিপদকে গ্রাহ্যই করে না। তিমি-ব্যবসায়ীরা বছরে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে।

যে সব জাহাজ তিমি শিকারে যায়, সেগুলো খুব শক্ত হলেও অনেক সময় তিমির ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ে।

তিমি শিকারীরা গ্রীষ্মকালে তিমির সন্ধানে বরফের সমুদ্রে যাত্রা করে। তিমি শিকারের এই একমাত্র সময়। যখন তারা ঠিক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়, তখন একজন লোক জাহাজের মাস্তুলে চড়ে বসে থাকে। সে দেখে তিমি গা ভাসান দিয়েছে কিনা। যখন দেখতে পায়, দূরে তিমি গা' ভাসান দিয়েছে, তখন সে চেঁচিয়ে ওঠে—"তিমি জল ছাড়চে—"

তখন ছোট নৌকো নামিয়ে দেওয়া হয়, আর তাতে যাদের গায়ে শক্তি আছে আর লক্ষ্য ঠিক সে-সব শিকারীদের নেওয়া হয়।

যে অস্ত্র দিয়ে তিমি শিকার করা হয় তার নাম হারপুণ্।

অতি আস্তে আস্তে নৌকো তিমির একেবারে কাছে আসে। যতক্ষণ না হারপুণ্ তার গায়ে লাগে, ততক্ষণ তিমি কিছুই টের পায় না।

হারপুণের সঙ্গে খুব শক্ত ও লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। দড়িটি লম্বায় হয় প্রায় ৪০০০ ফিট। কে জানে কত নীচে তিমি

তিমি শিকার

ডুব মারবে! অবশ্য আজকাল ইলেক্‌ট্রিক হারপুণ দিয়ে তিমি শিকার করা হয়ে থাকে।

যদি কোন শিকারীর পা সেই দড়ির মধ্যে আটকে যায়, তবে তার মরণ নিশ্চিত। সে উল্‌টে সমুদ্রে পড়ে যায়—কেউ তাকে আর রক্ষা করতে পারে না। কেননা হারপুণ্‌ গায়ে

রর্‌ কোয়াল্‌

লাগলেই তিমি এত দ্রুত ডুবতে থাকে যে, কেউ সে বেগ নিবারণ করতে পারে না।

কখনো কখনো তিমির লেজের ঝাপ্টায় বড় বড় নৌকো ডুবি হয়ে যায়। আবার যখন তিমি দেখা দেয়, তখন আবার তার গায়ে হারপুণ ছোঁড়া হয়। তিমি আবার ডুব দেয়, এবার তিমি আর বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকতে পারে না। বার বার মার খেয়ে শেষে তিমি পরিশ্রান্ত হয়ে অনেক ধস্তাধস্তির পর মারা যায়।

তারপর আর কি—তিমিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে জাহাজে

তিমি শিকার
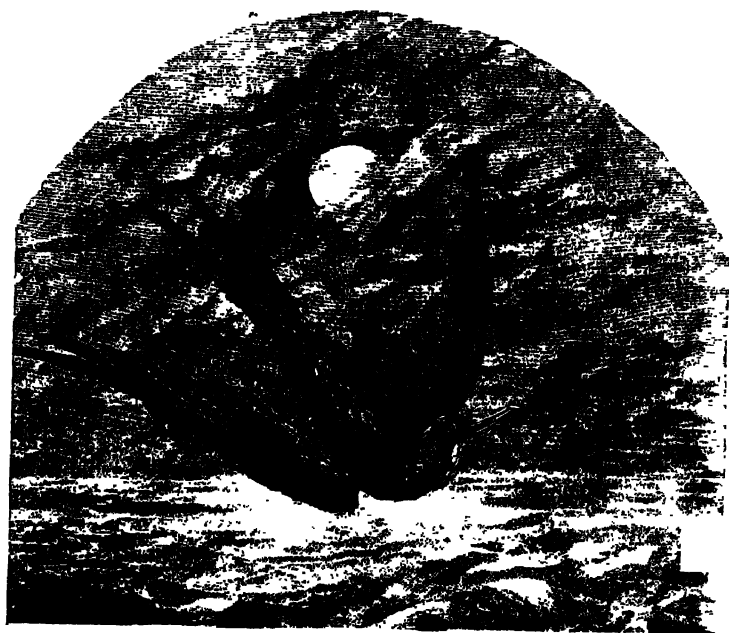
ভর্তি করে নাবিকেরা দেশে চলে যায়। তার তেল ও চোয়াল বিক্রি করে তারা অনেক টাকার মালিক হয়।

আর একরকম তিমি আছে; তার নাম রর্ কোয়াল্। এরা লম্বায় একশো ফিট হয়। তিমির চেয়ে এরা লম্বায় বড় বটে, কিন্তু চওড়ায় নয়। লোকে এদের বড় একটা শিকার করে না। এরা তিমির মতই নিরীহ।

নর হোয়াল

তিমির মত আর এক শ্রেণীর মাছ আছে, তার নাম হচ্চে, নর হোয়াল। এরা তিমির মত এত বড় বা কদাকার নয়। এরা দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। এদের গায়ের রং অনেকটা সাদা। কিন্তু এদের সকলের চেয়ে মজার জিনিষ হচ্চে শিং! এদের শিংটি মাথা থেকে সোজা লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে। এই শিংটি খাঁটি আইভরী এবং খুব দামী। জিনিষটা আসলে তিমির দাঁত। দাঁতটা মোচড়ান মোচড়ান হয়ে সুমুখে সরল রেখার মত চলে গেছে।

হাতীর দাঁতের চেয়ে নর হোয়ালের এই দাঁতটি দামী। এরা এই দাঁত নিয়ে যে কি করে তা' বোঝা যায় না। হয়ত এই দাঁত দিয়ে শিকার ধরে কিংবা মাটি খুঁড়ে বা বরফ ভেঙে নিঃশ্বাস নেবার জন্য জলের ওপরে ওঠে। আবার আত্মরক্ষা করবার জন্যও এরা এই শিংটি ব্যবহার করতে পারে।

এরা কিন্তু খুব নিরীহ জীব। কিন্তু হলে কি হয়, তার দাঁতের লোভে লোকে তাকে শিকার করতে বহু বিপদকে বরণ করে।

এরা এত ক্ষিপ্র যে সহজে এদের ধরা যায় না। কিন্তু জাল ফেললে এদের দাঁত জালে আট্‌কে যায়, আর এরা পালাতে পারে না। নিজেদের দাঁতই তখন এদের শত্রু হয়।

—শেষ—